SWADHINATA
O'
PROBASH CHINTA

[Independence and Thoughts While Living Abroad]

by Manzurul Islam.

PUBLISHED BY

Dewan Abdul Baset

Marupalash (Boipotro) **GROUP OF PUBLICATIONS**

DHAKA, BANGLADESH

FIRST EDITION

LINKBangla, House 239/A, Road 10/A, Dhanmondi, Dhaka-1209

July..2002

2nd Edition

Marupalash (Boipotro) **GROUP OF PUBLICATIONS**

DHAKA, BANGLADESH

Sept. 2002

INTERNET EDITION

SHIPON

October.. 2002

COMPUTER COMPOSED BY:

LUBNA BASET BRISHTI

Contact with writer

E-MAIL: marupalash@yahoo.com

স্বাধীনতা
ও
প্রবাস চিন্তা

মনজুরুল ইসলাম

(নির্বাচিত প্রবন্ধ)

ডক্টর মনজুরুল ইসলাম আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন প্রকাশনা বিশেষজ্ঞ। বর্তমানে তিনি রিয়াদে কিং সউদ ইউনিভার্সিটি'র একাডেমিক পাবলিশিং বিভাগে ফ্যাকাল্টি মেম্বার(অধ্যাপক) এবং সিনিয়র এডিটর হিসেবে কর্মরত আছেন। আন্তর্জাতিক ভাবে বহু কনফারেন্সে যোগদানকারী ডঃ মনজুর বিবিধ পত্র-পত্রিকা এবং জার্নালে গবেষণাধর্মী লেখা প্রকাশের একজন জ্ঞানতাপস ব্যক্তিত্ব। তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস-এর বাংলাদেশ শাখার প্রাক্তন চীফ-এক্সিকিউটিভ এবং বাংলাদেশ বুক্স ইন্টারন্যাশনাল এর প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ইউনেস্কো পাবলিকেশন্স (প্যারিস) এর আমাদের জাতীয় প্রতিনিধি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম, এ, সহ জার্নালিজমে ডিপ্লোমা এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশনা বিজ্ঞানে ডক্টরেট অর্জনকারী ডঃ মনজুর বেশ কিছুকাল যুক্তরাজ্য (অক্সফোর্ড) এবং কানাডায় পাবলিশিং কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেন। এছাড়া ইউরোপ, আমেরিকার বেশ ক'টি দেশে প্রকাশনা ও সম্পাদনা বিষয়ক এড্ভান্সড কোর্স সম্পন্ন করেন।

তিনি আমাদের নিয়মিত প্রকাশনা মরুপলাশ, মোহনা এবং রূপসী চাঁদপুর এ নিয়মিত লেখালেখি করেন।

-দেওয়ান আবদুল বাসেত

সম্পাদক, "মরুপলাশ, মোহনা,রূপসী চাঁদপুর
রিয়াদ, সউদী আরব
Email: marupalash@yahoo.com

স্বাধীনতা ও প্রবাস চিন্তা

লেখকের অন্যান্য বই/প্রকাশনা

বাংলায়

১। *স্বাধীনতা ও প্রবাস চিন্তা*
২। *বই কেমন করে হয়*
৩। *প্রকাশনা ও সম্পাদনা প্রসঙ্গ*
৪। *শিক্ষা প্রশাসন ও প্রবাসে শিক্ষাদান [সম্পাদক এবং যুগ্ম-রচয়িতা]*
৫। *দেশে প্রবাসে*
৬। *আমি ও আমরা (আত্মকথা)*

[বাংলায় প্রবন্ধাদি ৩৫টির অধিক]

ইংরেজিতে

(১-৭)। প্রকাশনা বিজ্ঞান ও সম্পাদনার উপর ৭টি গ্রন্থ (মূলতঃ গবেষণামূলক)*
(৮)। কবিতার বই ১টি (*'জেনারেশন লিংক'*)
(৯)। বিভিন্ন লেখালেখির সংকলন ১টি (*'লুকিং ব্যাক ঃ রাইটিংস্ অব ইয়ংগার ডেইজ'*)
(১০-১৭)। ছোটদের জন্য ইংরেজি শেখার কোর্স-বই। একটি সিরিজে ৮টি (*'লেট আস লার্ন ইংলিশ'*)

[ইংরেজিতে গবেষণা প্রবন্ধাদি, কনফারেন্স পেপার, অন্যান্য লেখালেখি একশ'টির কিছু বেশী। এছাড়া, ১৯৭০-২০০২ সময়ে বর্তমান লেখকের সম্পাদিত বা যুগ্ম-সম্পাদিত (অন্যদের রচিত) ৩৭০টি একাডেমিক বা গবেষণামূলক গ্রন্থ ও জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে।]

* ইংরেজি গ্রন্থ ৭টি ঃ
১। *'দি বুক ওয়ার্লড্ ইন বাংলাদেশ'*
২। *'বুক পাবলিশিং - এ্যা সিলেক্ট বিবলিওগ্রাফী অন বাংলাদেশ এ্যান্ড সাউথ এশিয়া'*
৩। *'এডভান্সম্যান্ট অব পাবলিশিং এ্যাজ এ্যা সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজী ইন দি ডেভালাপিং কান্ট্রিজঃ দি কেস অব থ্রী মুসলিম কান্ট্রিজ'*
৪। *'পাবলিশিং এডুকেশন এ্যান্ড বুক ডেভালাপম্যান্ট'*
৫। *'প্রবলেম্স এ্যান্ড প্রসপেক্টস ইন একাডেমিক পাবলিশিং: দি কেস অব সাউদি এরাবিয়া'*
৬। *'এডুকেশন এ্যান্ড ট্রেনিং ইন সাইন্টিফিক এ্যান্ড স্কলারলি পাবলিশিং'*
৭। *'প্রমোশন অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজী থ্রু পাবলিশিং ইন সাউদি এরাবিয়া'*

ISBN 984-741-010-5

উৎসর্গ

মা বাবা শ্বশুর শাশুড়িকে

-যাদের স্বতঃস্ফূর্ত দোয়ায় আমার প্রবাস জীবন কাটে;

পিয়াল বিতালী কুহেলকে

-আমাদের বড় ছেলে, পুত্রবধূ ও ছোট ছেলে - যারা নিজেরাও রয়েছে প্রবাস জীবনে, অন্যত্র; যাদের নিয়মিত ইন্টারনেটে ও টেলিফোনে যোগাযোগ, ভৌগোলিক দূরত্বকে ম্লান করে আমাদের প্রবাসজীবনকে রেখেছে অনেকটা দুশ্চিন্তামুক্ত;

এবং অবশ্যই

খালেদাকে

-যার সম্বন্ধে যতবেশী বলা হবে, ততই হবে কম; যে আমার নিত্যদিনের সংগী ও আমার প্রবাসজীবনের সকল কাজের সহযোগী- আমার দীর্ঘ প্রবাস জীবনের কিছু কিছু চিন্তা চেতনার প্রকাশ এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করলাম।

-গ্রন্থকার।

কৃতজ্ঞতা

যেসব প্রবাসী পত্রপত্রিকায় আমার এই গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সে সবের সম্মানিত প্রকাশক ও সম্পাদকবৃন্দের প্রতি জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতাঃ

- *মরুপলাশ*
- *মোহনা* (বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরামের মুখপত্র)
- *রূপসী চাঁদপুর* (মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী চাঁদপুর জেলাবাসীদের মুখপত্র)
- *প্রভা* (প্রভা সাহিত্য পরিষদ)
- *অন্যধারা* (অন্যধারা সাহিত্যাঙ্গন)
- *জালালাবাদ সমিতির স্মরণিকা*
- *নজরুল জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির স্মরণিকা*

- মনজুরুল ইসলাম

রিয়াদ, ২২শে আষাঢ় ১৪০৯।। ৬ই জুলাই ২০০২।

ISBN 984-741-010-5

স্বাধীনতা ও প্রবাস চিন্তা

সূচিপত্র

উৎসর্গ
কৃতজ্ঞতা

প্রবাস জীবন, দেশপ্রেম, স্বাধীনতা

১. প্রবাস চিন্তা .
২. স্বাধীন দেশের নাগরিক: দেশে ও প্রবাসে
৩. দেশপ্রেম এবং দেশপ্রেমিকের চৈতন্য
৪. বিজয় দিবস ঃ আত্মশুদ্ধির সময়

সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য

৫. বাঙালি ও বাংলাদেশী
৬. বাংলাদেশী সংস্কৃতি - প্রবাসে এর চর্চা
৭. নববর্ষ এবং প্রবাসে বাংলাদেশী সংস্কৃতির চর্চা
৮. যুগে যুগে পহেলা বৈশাখ ও আমাদের সংস্কৃতি
৯. বিশ্বমাতৃভাষা দিবস, বাংলা ও বাংলাদেশ
১০. একুশের চেতনা ঃ মাতৃভাষার যথার্থ সেবায় প্রবাসী
১১. নজরুল ঃ কালজয়ী প্রতিভা

শিক্ষা

১২. বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষাঃ এর কিছু সমস্যা সমাধানে একটি অভিনব বিকল্প সংযোজন - উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

১৩. দুইটি শুভেচ্ছা বাণী ঃ
(ক) সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় উৎসাহ প্রদান
(খ) সমাজসেবা ও সাহিত্যকর্মের পাশাপাশি চর্চা
১৪. প্রবাসীদের দৃষ্টিতে অগ্রাধিকার বিষয় সমূহ

১

প্রবাস চিন্তা

প্রবাসে থেকে দেশ ও প্রবাসের জন্য চিন্তাভাবনা করাকে এখানে আমরা ‘প্রবাসচিন্তা’য় আখ্যায়িত করছি। ব্যক্তিগত ও সাংসারিক বিষয়বস্তু নিয়ে তো চিন্তাভাবনা থাকেই। সদামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি অনেকের চিন্তা থেকে বাদ পড়ে না। আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বজনীন বিষয়ে চিন্তাভাবনা কারো কারো প্রবাসচিন্তার প্রধান অংশ জুড়ে নেয়। একজন বাংলাদেশী নাগরিকের চিন্তা-চেতনার বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপটে বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

যেদিন থেকে বিদেশে কিছুকাল বা দীর্ঘকাল বসবাস করার পরিকল্পনা মাথায় দানা বাঁধে, সেদিন থেকেই প্রবাসচিন্তার জন্ম। একজন শ্রমিক বা কর্মজীবী, কিংবা একজন পেশাজীবী বা বিশেষজ্ঞ যিনিই হউন না কেন এবং তিনি বাংলাদেশের রাজধানী শহরে বা কোনো জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, বিদেশে কাটাবার ইচ্ছা পোষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহ□ণ করার পরমুহূর্ত থেকে শুরু করেন প্রবাসচিন্তা। যার যার যোগ্যতা, সামর্থ্য ও অবসর অনুযায়ী প্রত্যেকে এই প্রবাসে চিন্তা বিস্তার করেন, কখনো কখনো আপনা আপনি এর জাল বোনা হয়ে যায়। কখনো সমুদ্রের এক তীরে বসে সম্মুখের সীমাহীনতায় হারিয়ে যাবার মতো অবস্থায় চিন্তার রেশ টানা হয়। একেক সময় প্রবাসচিন্তা নিয়ে খেই হারিয়ে ফেলা হয়।
প্রবাসে কী এত চিন্তা ? এর খানিকটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি। প্রথমে প্রবাসে সম্ভাবনাময় জীবনের রূপদান করতে প্রারম্ভিক প্রস্তুতি -- আর্থিক, মানসিক ও পারিবারিক। পরবর্তী এক পর্যায়ে প্রবাসে পৌঁছেই পেছনে ফেলে আসা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সমাজ ও দেশের স্মৃতিবিজড়িত বিষয়াদি। বর্তমানকর্মস্থলের চিন্তাভাবনা- কাজকর্ম, লোকজন ইত্যাদিও। এখানকার পরিবেশ, জীবনযাপন পদ্ধতি, আরো বহু বিষয় নিয়ে জ্ঞানলাভ করা এবং তাতে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা। তারপর দেশের সাথে চিঠিপত্রে, টেলিফোনে, ইন্টারনেটে, ফ্যাক্সে এবং অন্যান্যভাবে যোগাযোগ রক্ষা। দেশে অর্থ পাঠানো থেকে শুরু করে উপহার, ফটো, ক্যাসেট এবং প্রয়োজনীয় জিসিনপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করা। এটা কখনো নিয়মিত, কখনো অনিয়মিত, কখনো বা একেবারে অনুপস্থিত।

বাংলাদেশ থেকে যারা বিদেশে গমন করেন তাদের প্রবাসচিন্তায় তারতম্য হয় বসবাসরত দেশটিকে কেন্দ্র করে। যেমন, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে প্রবাস জীবন মূলত কর্মসংস্থান কেন্দ্রিক এবং অস্থায়ীভাবে থাকার পরিকল্পনা। অপরদিকে, পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে প্রবাস

জীবন শুরুতে যেভাবেই পত্তন হোক না কেন - যথা, উচ্চশিক্ষা, কর্মসংস্থান, ইমিগ্রেশন ইত্যাদি- সেখানে স্থায়ী বসবাসেরও থাকে একটি মৌন আকাঙ্ক্ষা। ধীরে ধীরে ঐ দেশী নাগরিক হয়ে যাবার থাকে অদম্য বাসনা। উচ্চতর জীবন যাপনের উপকরণ, ছেলেমেয়েদের জন্য উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, আধুনিক বিশ্বের কলাকৌশল ঐসব দেশে রয়েছে বলে আপাতদৃষ্টে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মতো সঞ্চয় তেমন সম্ভব না হলেও পাশ্চাত্যে পাড়ি জমাবার চেষ্টা অনেকেরই থাকে। সোনার হরিণের সাক্ষাতলাভ হয় কিনা !

* * * *

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর এবং সেই দেশে ফেরার প্রাক্কালে বা প্রবাস জীবনের মাঝখানেই বাংলদেশের নাগরিক হিসেবে বা বাঙালি হিসেবে আমাদের কর্তব্যবোধে আরেকটু জাগ্রত হতে কি পারি না আমরা? বর্তমান আলোচনায় প্রবাসচিন্তার এক বিশেষ দিকে আলোকপাত করা হবে - দেশগঠনে প্রবাসে বসে আমাদের কী ধ্যান ধারণা, কী বাস্তবতা, কী পরামর্শ। প্রবাসে চিন্তাচেতনার বিশাল ক্ষেত্র থেকে কিছু এখানে উল্লেখ করা হলো মাত্র।

দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধ

সর্বাগ্রে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা, এর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দেশের অবকাঠামো তৈরী, স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত বিষয়ে অধিকতর দৃষ্টিদান, শিক্ষা-সংস্কৃতিক্ষেত্রে বহির্বিশ্বে অবস্থান করে নেয়া, সামাজিক অবক্ষয়রোধ, দূর্নীতি দমনে সহযোগিতা, ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টিদান করা প্রয়োজন প্রত্যেক বাংলাদেশী প্রবাসীর। সাধারণ অর্থে, ব্যক্তিগতভাবে কারো অবদানই বৃহৎ হতে পারে না, দেশের প্রয়োজনের তুলনায়। কিন্তু আবার কোনো অবদানই তুচ্ছ নয় - সকলের একত্রীকরনেই তো বিশালত্বের ঠিকানা মিলে।

প্রবাসে বসে দেশের সত্যিকারের ইতিহাস এবং এর স্বাধীনতার তাৎপর্য সম্বন্ধে অবশিষ্ট প্রবাসী এবং উৎসাহী বিদেশীকে অবগত করানো; স্বাধীনতা বিরোধীদের পূর্বাপর নেতিবাচক ভূমিকা ও মাতৃভূমির প্রতি আনুষঙ্গিক কর্তব্যবোধে এই গোষ্ঠীর অনীহা এবং অপচেষ্টার তৎপরতা - এসবের দিকে প্রবাসী দেশবাসীকে সতর্ক করানোতে দেশপ্রেমিক প্রবাসীর দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা থাকে। নিজের কাজকর্মে, আচার-আচরণে, পেশাগত দক্ষতা প্রদর্শণে এবং দেশের প্রতি অপরাপর দায়িত্ববোধে নিজেকে গঠনমূলকভাবে প্রস্তুত করা প্রবাসীর চিন্তার অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দুই একটি বিষয়ে ব্যাখ্যাদান প্রয়োজন। যেমন, স্বাধীনতা অর্জিত না হলে বর্তমান বাংলাদেশীর অবস্থান আজ কোথায় হতো, তা তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করে প্রবাসীদের নতুন প্রজন্মকে বোঝাতে হবে এবং সাথে সাথে যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে এর রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। বিশেষ করে এখনো যারা বাংলাদেশী পাসপোর্টে প্রবাসে বাস করেও স্বাধীনতা বিরোধী আলাপচারিতা ও কাজকর্মে নিজেদের লিপ্ত রাখছেন, সেই স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের জল্পনাকল্পনাকে সমূলে বিনাশ করতে হবে। একটি দেশে বড়

রকমের কারণ ছাড়া স্বাধীনতা লাভের চিন্তার উদ্রেক হয় না; স্বাধীনতা সহজে অর্জিত হয় না; পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে গিয়ে যে চরম কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, তার উত্তরণের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে দেশপ্রেমিকের ভূমিকা। সকল প্রবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে দেশের চিন্তায়; ঐ সবুজ পাসপোর্ট ধারণের মর্যাদা যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেদিকে সবার দৃষ্টি দিতে হবে, দলমত নির্বিশেষে।

সত্যিকারের দেশপ্রেমিক যেমন স্বাধীনতা বিরোধীদের চিন্তা চেতনাকে খণ্ডন করবেন, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্রভাবে হলেও অবদান রাখবেন। প্রবাসে বসেও তা করা যায়। প্রধানত কষ্টার্জিত অর্থের সম্ভাব্য মূল অংশ আইনসিদ্ধ প্রথার মাধ্যমে দেশে পাঠিয়ে এবং যতটা সম্ভব তা বিনিয়োগ করে। প্রবাসে বসে বে-আইনিভাবে অর্থপ্রেরণ থেকে সংশ্লিষ্টদের বিরত করার ব্যাপারে বোঝাতে হবে। দেশী পণ্যকে বিদেশে পরিচিত করাতে সাহয্যের হাত বাড়াতে হবে, যেখানে যেখানে সম্ভব নিজে ব্যবহার করেও। দেশে প্রেরিত অর্থ দিয়ে অপ্রয়োজনীয় বা বিলাস সামগ্রীতে সামর্থ্যের বাইরে খরচ করা থেকে দেশে রেখে আসা আত্মীয়স্বজনকে অনুৎসাহিত করতে হবে।

উচ্চতর ও কারিগরি শিক্ষা প্রসঙ্গ

শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট উন্নয়নের অবকাশ রয়েছে। প্রবাস চিন্তায় থাকতে হবে শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলো কেমন করে দ্রুত উন্নয়নের পথে এগুচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা, সুশিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা কীভাবে চালু করা যায় তাতে সহায়তাদান, যুবসমাজের কর্মদক্ষতা ও উদ্দীপনা কেমন করে মজবুত করা যায় তা উপলব্ধি করা, পুঁথিগত শিক্ষার সাথে সাথে প্রায়োগিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া, ইত্যাদি। বিএ, এমএ, পাশ করে বা উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে সবাইকে পণ্ডিত হবার দরকার নেই। মৌলিক শিক্ষা লাভের পর দেশের প্রয়োজনে এবং শিক্ষার্থীর প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন কারিগরি ও আধুনিক বিষয়ে নিজেদেরকে গড়ে তোলাতে প্রবাসীর চিন্তাধারা সাজাতে হবে। আজ পার্শ্ববর্তী দেশ কিংবা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দিকে তাকালেই স্পষ্টতর হয়, তারা কী গতিতে সামনের দিকে চলছে। কোন্ কোন্ বিষয়ে তারা শিক্ষাক্ষেত্রে এবং প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দিচ্ছে। বর্তমান প্রবাস থেকে কিছু অর্থোপার্জন করে আরো উন্নত দেশে প্রবাস স্থানান্তর করে (আর বর্তমান প্রবাসটিই উন্নত হলে সেখানে বসেই) আধুনিক বিষয়াদিতে শিক্ষালাভ করে আরো কীভাবে নিজেদেরকে যুগোপযোগী করে তোলা যায়, কেমন করে বহির্বিশ্বে শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আসন করে নেয়া যায়, যেমন করেছে ভারত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া এবং যেমন এদের আগে থেকে করে আসছিলো জাপান, কোরিয়া, হংকং, তাইওয়ান ও ফিলিপাইন ।

প্রবাসচিন্তায় থাকতে হবে - দেশে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা না বাড়িয়ে গুণগত মানবৃদ্ধিতে মনোযোগ দেয়া। উদাহরণস্বরূপ, শুধুমাত্র এশিয়ার জরিপকৃত ৭৭টি

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কেন এককালের প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়টি (ঢা. বি.) ৬৪তম স্থান পেলো সার্বিক মানের বিচারে। কেন প্রথম দশটির মধ্যে নয়, আশি বছরের প্রাচীন হয়েও !*

স্কুল শিক্ষা প্রসঙ্গ

কেন মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় এখনো অধিকাংশ ছাত্র অকৃতকার্য হয় - অভিভাবক এবং রাষ্ট্রের প্রভূত সম্পদ অপচয় করে? কেন লজ্জাজনক ও বল্গাহীনভাবে পরীক্ষার্থীদের নকল ও পরীক্ষাপ্রশাসকদের দূর্ণীতি কমছেনা। এছাড়া অনুসন্ধান করতে হবে পুরোপুরি বাংলাদেশী কোর্স অনুসরণ করা গুটিকয়েক প্রবাসী স্কুল যে মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছে - সর্বসাকুল্যে সাতটির মতো - সেগুলোতে কেন ছাত্রসংখ্যা এক একটিতে সর্বাধিক আটশ', যেখানে ভারতীয়, পাকিস্তানি স্কুলগুলোতে এর দশ-বারো গুণ বেশি; কেন মানের দিক থেকেও বাংলাদেশী স্কুলগুলো উন্নততর হচ্ছে না। এ ব্যাপারে প্রবাসী সর্বমহলের

---

*[সূত্র ঃ *এশিয়াউইক হংকং* ৩০ জুন ২০০০। মাপকাঠি = (ক) একাডেমিক সুনাম, (খ) ভর্তি প্রক্রিয়া ও ছাত্রছাত্রী নির্বাচন, (গ) ফ্যাকালটি রিসোর্স, (ঘ) গবেষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল, (ঙ) আর্থিক সংগতি ।]

সহযোগিতা থাকতে হবে। শুধুমাত্র শিক্ষক-অভিভাবক দিয়ে আশাপ্রদ উন্নয়ন সম্ভব নয়, এদের বাইরে থেকেও নিঃস্বার্থভাবে আর্থিক সমর্থন এবং পেশাগত বা একাডেমিক পরামর্শের প্রয়োজন - কমিউনিটি হতে স্বচ্ছল ব্যক্তিবর্গ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এই পদে সম্পূরকতা অর্জন সম্ভব। দেখা গিয়েছে বিশেষ স্কুলগুলোর আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করতে না পারায় যোগ্যতর শিক্ষকমণ্ডলী পাওয়া যাচ্ছে না। যাদেরও বা পাওয়া যায় তাদের মেধা ও শ্রমের একটা মোটা অংশ ব্যয় হয় প্রাইভেট টিউশন বা অন্য উপার্জনের কাজে। দুই একটি বাদে বাকি স্কুলগুলোতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব পরিলক্ষিত হয় - যথাঃ ভালো লাইব্রেরি, ল্যাবোরেটরি, আচ্ছাদিত খেলার মাঠ, কম্পিউটার, উপযুক্ত শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষকমণ্ডলীর যথোপযুক্ত কমনরুম ইত্যাদি।

পাশ্চাত্যে (যথা ঃ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা) শুধু বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি শেখাবার যে ছয়-সাতটি এবং বিশেষ করে বৃটেনে প্রায় পঞ্চাশটির মতো ছোটখাটো প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এর প্রত্যেকটিতে প্রবাসী বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ আরো প্রসারিত করতে হবে। দেশীয় সংস্কৃতিচর্চা ও ঐতিহ্য রক্ষার পরিবেশ আরো সুসংগঠিতভাবে সৃষ্টি করতে হবে।

দেশের কর্মসংস্থানের চাহিদানুযায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে আধুনিক পদ্ধতিতে ঢেলে সাজাতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে আরেকধাপ ঊর্ধে উঠতে হবে। একবিংশ শতাব্দীতে

আর শুধু নাম সই করতে জানলে "স্বাক্ষর" নয়, সহজ সাধারণ বইপুস্তক, কাগজপত্র পড়ে বুঝতে পারা এবং চিঠিপত্র মোটামুটি লিখতে পারা - ইত্যাদি যোগ্যতা অর্জন করলে সত্যিকারের "শিক্ষিতের হারে" গণ্য হবে। প্রবাসীরা দেশবাসীকে এ ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতে পারেন। এছাড়া প্রবাসী পারেন সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির যথাসম্ভব চর্চা করে যেতে। এই সবই প্রবাস চিন্তার আওতাভুক্ত।

প্রবাসী পেশাজীবী ও বাংলাচর্চা

পেশাজীবীদের (যথাঃ বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, একাউন্ট্যান্ট, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ, কূটনীতিক, প্রশাসক ইত্যাদি) প্রবাস সময় উত্তমভাবে কাজে লাগাবার অন্যতম উপায় হচ্ছে দেশের ও কমিউনিটির কাজে নির্দলীয়ভাবে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রবাসী সংস্থার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা এবং তাতে সহযোগিতা বা উপদেশ দান ছাড়াও লেখালেখির কাজে অবদান রাখা। আর লেখালেখির কাজ প্রধানতঃ হবে মাতৃভাষায় - যেহেতু কমিউনিটির অধিকাংশ পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে এই ভাষায়। এতে প্রফেশনাল বা বিশেষজ্ঞদের বাংলাচর্চায় উৎকর্ষতা বাড়বে। নিজের কর্মক্ষেত্রে পেশাগত বিষয়ে লেখালেখির জন্য তো ইংরেজির আশ্রয় ছাড়া উপায় নেই। অতএব বাইরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের বৃহত্তর অংশের কাছে পৌঁছাবার জন্য বা তাদের সহজে বোধগম্যতার জন্য বাংলাভাষায় পেশাগত বা অনেকের কাজে আসতে পারে এমন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা বা সুচিন্তিত মতামত পেশ করা যেতে পারে। এতে সাহিত্য বা ভাষাচর্চার কাজটিরও হয় কিছু অগ্রসরতা। এমনিতে প্রবাসে বসে বাংলাভাষায় লেখালেখি করবার সুযোগ কতটুকু!

আমাদের জানামতে, অন্ততঃ কয়েকজন পেশাজীবি রিয়াদে বসেই তাদের স্বস্বক্ষেত্রে -- যথা, প্রকাশনা-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, চিকিৎসাশাস্ত্র, শিক্ষাদান, ইত্যাদিতে -- সহজবোধ্য বাংলাভাষায় নিয়মিতভাবে লিখে যাচ্ছেন বিভিন্ন প্রবাসী পত্র-পত্রিকায়। এই সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধিকরণ কি খুব অসাধ্য ? ব্যাংকিং, কম্পিউটার বিজ্ঞান, প্রকৌশল, হিসাব ব্যবস্থাপনা, প্রভৃতি বিষয়ে বাংলায় লেখার মতো প্রবাসী পেশাজীবীর অভাব থাকার কথা নয়। অভাব সদিচ্ছার।

প্রবাসচিন্তায় পূর্বে উল্লেখিত সামাজিক অবক্ষয়রোধ, রাষ্ট্রীয় মানমর্যাদার বিকাশ, স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত বিষয়ে অধিকতর দৃষ্টিদান, শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পরবর্তীতে সবিশেষ আলোচনা করা যাবে।

['প্রভা', সংখ্যা ১৭, কার্তিক , ১৪০৭]

২

স্বাধীন দেশের নাগরিক: দেশে ও প্রবাসে

স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরেও কতগুলো ধারণা আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে যার বিকল্প চিন্তাভাবনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এসবের পূর্ণর্বিবেচনা আবশ্যক। মুক্তিযোদ্ধা, দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার সপক্ষের ব্যক্তি - এদের মধ্যে কি আমরা বড় রকমের পার্থক্য খুঁজবো। বিচার করতে বসবো কি কে বড় কে ছোট, কার গুরুত্ব বেশী, কার কম -এ নিয়ে?

সচরাচর অর্থে আমরা যা বুঝি তা হলো - একাত্তরের ২৬শে মার্চ থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মূলতঃ রণাংগনে শত্রুসনার বিরুদ্ধে যারা লড়েছেন তারাই মুক্তিযোদ্ধা। এছাড়া এই যোদ্ধাদের রণাংগনে সাহায্য করার জন্য যারা বিভিন্নভাবে পিছন থেকে বা দেশের অভ্যন্তর থেকে সরাসরি অংশগ্রণ করেছেন, তারাও এই পর্যায়ভুক্ত। আরেক অর্থে, বিদেশে বা প্রবাসে যারা দেশ থেকে গিয়ে বা ঐ সময়ে সেখানে বসবাস করে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বিভিন্নভাবে (যথা আর্থিক, প্রচারভিত্তিক, নৈতিক ইত্যাদি) অবদান রেখেছেন বা দেশের মুক্তির জন্য যে কোন রকম কাজ করেছেন, তারাও মুক্তিযোদ্ধা।

প্রায় নয়মাস সময়ই ছিলো মুক্তিযুদ্ধকাল। দেশপ্রেমিক অর্থ - আরো ব্যাপক। যে কোন সময় বর্তমান বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চলে বাস করে বা বিদেশেও অবস্থান করে মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য যারা চিন্তাভাবনা করেন এবং দেশের দুর্যোগ মূহুর্তেও নিজেদেরকে লুকিয়ে না রেখে যে কোন রকম উন্নয়নের জন্য অবদান রাখেন, দেশবাসী এবং দেশের জন্য ভালোমন্দ বিবেচনা করে আন্তরিকতার সাথে অন্যদেরকেও দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করেন, তারা সবাই দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেমিক স্বদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং উন্নতিতে গভীর আস্থা স্থাপন করেন - যে কোন মূল্যে এগুলো রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন। দেশে যত করুণ অবস্থাই বিরাজ করুক না কেন, সত্যিকারের দেশপ্রেমিক মাতৃভূমির জন্য গর্ববোধ করেন, সার্বভৌমত্বে তৃপ্তিবোধ করেন। দেশের ভুলত্রুটি সমাধানের চেষ্টায় নিয়োজিত থেকে দেশের পজিটিভ দিকে দৃষ্টিদান করে নিগেটিভ বিষয় সমূহে হতাশাগ্রস্ত না হয়ে দূরীকরণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন বা যাদের অধিকতর যোগ্যতা ও সামর্থ্য আছে তাদের পদক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করান। এই দেশপ্রেমিক যে কোন কালে যে কোন স্থানে হতে পারেন।

স্বাধীনতার সপক্ষের ব্যক্তি যে কেউ হতে পারেন না, স্বাধীন দেশটিতে বাস করলেও না। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বা তার বহু পূর্বে - যখন থেকে এই অঞ্চলের লোকের মধ্যে আপন সত্ত্বা ও মর্যাদা নিয়ে স্বাধীনভাবে বসবাস করবার প্রতিজ্ঞা জন্মায়, এবং বর্তমান পর্যন্ত (যখন কেউ কেউ এর স্থায়িত্বে এখনো সন্দিহান) যাদের চিন্তাধারায় প্রভূত উন্নত জীবনের আশ্বাসেও অন্যের অধীনে দেশকে দেখার আগ্রহ নেই, যারা দেশটিকে যে কোন মূল্যে স্বাধীন রাখার জন বদ্ধপরিকর, তারাই স্বাধীনতার সপক্ষের মানুষ।

যারা দেশের স্বাধীনতা বিরোধী ও শত্রুদের সাথে আপোষ করতে চান, যারা মানসপটে এখনো ধারণ করে রেখেছেন যে, স্বাধীনতার আগেই দেশটি ছিলো ভালো, এবং যারা স্বাধীন না থেকে পূর্বের শত্রুদেশ বা বর্তমানের কোন মিত্র দেশের সাথে হাত মিলিয়ে নিজেদের সার্বভৌমত্বকে বিকিয়ে দিতে চান - তারা সবাই স্বাধীনতা বিরোধী। এদেরকে যারা প্রতিহত করেন, যারা অনাদিকালের দেশপ্রেমিক, যারা বহুকাল থেকে লালিত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সম্মান করেন অথবা যারা স্বাধীনতার মূল যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা, তারা সবাই স্বাধীনতার সপক্ষের ব্যক্তি।

দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার সপক্ষের ব্যক্তি ও মুক্তিযোদ্ধা এই তিন ধরনের বাংলাদেশীর ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এই ত্রয়শক্তির সম্মিলিত এবং সমন্বিত অবদান দেশকে রাজনৈতিকভাবে করতে পারে আরো প্রত্যয়ী। স্বাধীনতাবিরোধী চক্র এবং শত্রুশক্তির সবরকম ষড়যন্ত্র ও কুপ্রচেষ্টা বাংলাদেশের সোনালী মাটি থেকে যতশীঘ্র মুক্ত করা যাবে ততই সম্ভাবনা থাকবে সোনার বাংলা বাস্তবায়নের। নতুন প্রজন্মের ভূমিকা ও গুরুত্ব থাকবে এর রূপদানে। এরা তাদের পূর্বসূরীদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে সার্বভৌমত্বের সাথে ধরে রাখবে এবং একে করবে আরো উন্নত।

বর্তমানে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের কম যারা তারা তো মুক্তিযোদ্ধা হতে পারেন না। কিন্তু তারা হতে পারেন তাদের অগ্রজদের আদর্শে অনুপ্রাণিত। বীর মুক্তিযোদ্ধা দাবী করার জন্য দরকার নেই আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের। তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেও যেটি পারে তা হচ্ছে দেশপ্রেমিক হিসাবে এবং স্বাধীনতার সপক্ষের বাংলাদেশী হিসাবে সবসময় টিকে থাকতে। নতুন প্রজন্মকে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যায় না। মুক্তিযোদ্ধারা যেমন শত্রুদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন জানমালের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে, তেমনি বর্তমান প্রজন্মের বাংলাদেশীরা পারবে নিজেদেরকে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলে দেশগড়ার কাজে দায়িত্ব পালন করতে এবং দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনতার বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন দেশবাসীকে সংশোধন করাতে, চাপ সৃষ্টি করতে।

যারা ছাত্র, তারা দলীয় রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে সত্যিকারের লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করবে -- শেখার জন্য, জানার জন্য; শুধু ডিগ্রীর জন্য নয় বা শুধু চাকুরির জন্য নয়। যারা শ্রমিক

তারা আরো দক্ষতা অর্জন করবে এবং নিজস্ব দায়িত্ব নিষ্ঠা ও সততার সাথে পালন করবে; যারা কৃষিজীবী তারা আধুনিক পদ্ধতি রফ্‌ত করে উন্নয়ন করবে তাদের কৃষি সম্পদকে; যারা চাকুরে তারা চেষ্টা করবে সততার সাথে সেবার মানস নিয়ে কাজ করতে - শুধু বেশী করে মনে রাখতে হবে তারা এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের কর্মচারী, কর্মকর্তা; তারা মালিক বা প্রভুপক্ষ বলতে কিছু নয়; তারা সত্যি সত্যি 'ফ্রেন্ডস, নট মাষ্টার্স'; যারা ব্যবসায়ী বা পেশাজীবী তারাও নিজ নিজ ব্যবসা বা পেশায় দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান তৈরী করবে ও সেবামূলক মনোভাব পোষণ করবে।

ঔপনিবেশিক শাসনামলের বৃটিশ আমলাদের মতো বসকে বা উর্ধতন কর্মকর্তাকে 'স্যার' সম্বোধন করার বা মালিক ভাববার কোন যুক্তি নেই, তেমন পত্রশেষে বা দরখাস্থ শেষে 'আপনার বিশ্বস্ত বা অতি বিশ্বস্ত সার্ভেন্ট বা সেবক', এর বদলে বর্তমানে স্বাধীন দেশে তা হওয়া দরকার - 'আপনার আন্তরিক সহমর্মী' বা 'আপনার সহযোগী' বা 'সহকর্মী' বা 'গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের সেবায়' ... ইত্যাদি। আবেদনকারী কোন ব্যক্তি বা পাবলিকের দরখাস্থের প্রত্যুত্তরে সম্বোধন শেষে সরকারি কর্মচারী বা কর্মকর্তার লেখা উচিত, 'আপনার/আপনাদের আন্তরিক সেবায় ....' ইত্যাদি। প্রতিটি পত্রে এইটুকু পুনর্বার লেখা থেকে স্বভাবতই যে উপলব্ধি হবে, তা সরকারি কর্মকর্তার সেবার মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

প্রত্যেকেরই প্রতিজ্ঞা হতে হবে সৎপথে অবস্থান করে নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে যার যার কাজ করা; দলমত নির্বিশেষে কতগুলো জাতীয় বিষয়ে ঐকমত্য বজায় রাখা এবং স্থায়ীভাবে সমাধান বের করা - সরকারের পরিবর্তনের সাথে সাথে যাতে সবকিছু দুর্বল হয়ে না পড়ে। গণতন্ত্রে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নির্বাচিত সরকার আসবে যাবে। তাতে পরীক্ষিত ও পদ্ধতিগত বিষয়ে বা শুদ্ধ সিস্টেম্‌স-এর কোন পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন নেই।

স্থায়িত্বের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি নিরপেক্ষ উপদেষ্টা পরিষদ থাকা বাঞ্ছনীয় যার কাজ হবে স্বাধীনভাবে, সকল পক্ষের প্রভাবমুক্ত হয়ে দীর্ঘমেয়াদী কিছু পলিকল্পনা প্রণয়ন করা। এগুলোর বাস্তবায়ন সরকার বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহই করবে, কিন্তু সেগুলোর টেকনিক্যাল মনিটরিং বা খোঁজখবর রক্ষা করবে উক্ত উপদেষ্টা পরিষদ। সার্বিক আলোচনা করবে, প্রথমে জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি এবং পরে পূর্ণ সংসদ। এই উপদেষ্টা পরিষদ সরকারি কর্মকর্তা বা ব্যুরোক্র্যাটদের একক গুরুত্ব কমিয়ে বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিত্বশীল সদস্য, নাগরিক এবং কিছু বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত হবে। এই পরিষদ রাষ্ট্রের স্থায়ী বিষয়গুলো নিয়ে পরিকল্পনা রচনা করবে। প্রতি সরকার এগুলো পরিবর্তন না করে বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকবে। সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত সরকারের নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ প্রগ্রামগুলোও বাস্তবায়িত হবে।

উদাহরণস্বরূপ, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়ে জাতীয়ভাবে হরতাল পালন করা যাবে কিনা; পালিত হলেও, তার নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া যায় কিনা; দেশের সংকটময় মূহুর্তে বা জরুরী অবস্থায় পার্লামেন্টে সচরাচর ৯০ দিনেরও কম উপর্যুপরি কম কতদিন অনুপস্থিত থাকলে বা অংশগ্রহণ না থাকলে, সাংসদদের সদস্যপদ বাতিল হবে বা তাদের সুযোগ সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত করা হবে; ছাত্রেরা সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে কিনা; বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণে আমাদের দেশের পক্ষ থেকে দেশের স্বার্থে কিছু পূর্বশর্ত আরোপ করা যায় কিনা - ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক সরকারের আওয়তামুক্ত জাতীয় মতামত নির্ণয় করা যায় উপরোক্ত পর্ষদের মাধ্যমে। অনতিবিলম্বে একজন ন্যায়পাল নিয়োগ করে সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যবিধি পর্যবেক্ষণে রাখা যায় কিনা, সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেয়া আবশ্যক।

বৈদেশিক সম্পর্ক স্থিতিশীল ও প্রগাঢ় করার উদ্দেশে আমাদের কুটনীতিকদের একটি সদ্য স্বাধীন উন্নয়নগামী রাষ্ট্রের নিবেদিত প্রতিনিধি হিসাবে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। যথা - একজন সিনিয়র কুটনীতিককে তিরিশ বছরের প্রবাস জীবনের মধ্যে অন্ততঃ দু'টি ভাষাভিত্তিক অঞ্চলে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। যেমন - আরব দেশ সমূহে তিন বছর বা তারো বেশী কাজ করতে চাইলে দেশে বসেই অন্ততঃ একবছরে বিশেষ কোর্স করে আরবী ভাষায় কাজ চালাবার মতো ভাষাজ্ঞানের দক্ষতা অর্জন করা কাম্য। ইংরেজি ছাড়াও এরকম মূল বিদেশী ভাষার (আরবি, রাশিয়ান, জার্মান, ফরাসী, স্পেনিশ, চাইনিজ, জাপানি) যে কোন একটি বা দু'টি জানা থাকলে কুটনৈতিক কাজের সহায়তা হয়। বহু দেশের কুটনীতিকেরা এই পারদর্শিতা অর্জন করে ঐসব দেশে পোষ্টিং নেন। ভাষাজ্ঞান একটি অত্যাবশকীয় সম্বল। এছাড়া, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কর্মস্থলের দেশটি থেকে সংশ্লিষ্ট কুটনীতিকের কী কী বিশেষ ভূমিকার ফলে অর্থবহ অবদান বাস্তবায়িত হয়েছে, তা পুংখানুপুংখরূপে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

দেশের ভিতরে সিভিল সার্ভিস বা প্রফেশনাল চাকুরিগুলোর সদস্যদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যেন ঘুষ না খাওয়া হয়, অযথা ও অন্যায়ভাবে যেন জনগনের কাজ বা সমস্যা সমাধানের বিলম্ব না করা হয় এবং যেন একই কাজের জন্য বহু টেবিলে ঘুরাঘুরি বা বিভিন্ন অফিসে দৌড়াদৌড়ি করতে না হয়। বাধা নয়, সাহায্য করার মনোবৃত্তি তৈরী করতে হবে, প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে।

নিজ নিজ কাজের জন্য কোন ব্যক্তিকে সরকারি অফিসে যাতায়াত করতে হলেও সরকারি কর্মকর্তাকে স্মরণ রাখতে হবে, দেশবাসীর সম্মিলিত কাজ থেকেই হয় দেশে উন্নয়ন। একটি গৃহ নির্মাণ করলে বা ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করতে চাইলে বা কোন ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে চাইলে বা কৃষিকাজে ঋণ গ্রহণ করলে, তা সার্বিকভাবে দেশের উন্নয়নকাজেই অবদান রাখবে। ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যোন্নয়ন থেকেই তো হবে জাতির ভ্যাগ্যের পরিবর্তন - ক্ষুদ্র থেকেই বৃহৎ; মাইক্রোর পরেই ম্যাক্রো। একটি স্বাধীন দেশের আমলা বা সরকারি

কর্মকর্তাদের তাই মূল্যায়ন হবে এইভাবে --- যে, কে জনগনের কতজনকে কতটুকু সাহায্য করতে পেরেছেন, কাজটি সমাধা করতে কত ত্বরান্বিত করতে পেরেছেন। স্বাধীন রাষ্ট্রে এখন আর বাধা সৃষ্টি করা নয়, বরঞ্চ সমস্যার শীঘ্র সমাধান করাতেই হবে কর্মকর্তার কৃতিত্ব, তার ব্যক্তিগত পদোন্নতির মাপকাঠি। তিনি কত অধিকসংখ্যক ব্যক্তির বিষয় কত শীঘ্র ও সুষ্ঠুভাবে সুরাহা করতে পেরেছেন তার উপরই পর্যালোচনা হবে তার কর্মদক্ষতার। এছাড়া, কত সম্মানসূচক ও বন্ধুসুলভ আচরণ তিনি তার কাছে আসা ব্যক্তিকে প্রদর্শন করতে পারলেন, কত হাসিমুখে বা সন্তুষ্টির সাথে কতজনকে বিদায় করতে পারলেন, তাও হবে বিচার্য। তবেই সার্থক হবে স্বাধীন দেশের আমলাতন্ত্র। অন্যথায় এটা হবে বোঝা, আমলারা হবেন গণবিমুখ 'মাষ্টারস', বন্ধু নয়। হবেন গণতন্ত্রের অন্তরায়; আরেক অর্থে স্বাধীনতারও।

একটি স্বাধীন দেশে কার্যপদ্ধতি হতে হবে ১৯৪৭ - পূর্ব পরাধীন এবং ১৯৭১-পূর্ব স্বাধীন-হয়েও-পরাধীন দেশের সিষ্টেমগুলোর চেয়ে অনেকক্ষেত্রে ভিন্ন। আমলাদের ভাবতে হবে জনগনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে পারাতে তাদের যোগ্যতা প্রমাণিত হবে। তারা জনগনকে সরকারি কাজের রীতিনীতির ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত ও সহজ পদ্ধতিতে সহায়ক হিসাবে নির্দেশ প্রদান করবেন। জনগনের দায়িত্ব হবে সরকারি কর্মকর্তাদের কোন উৎকোচ গ্রহণে উংসাহিত না করা; অনিয়মিতভাবে কোন কাজ সমাধা করতে না চাওয়া ও আপন আপন দায়িত্ব নিয়ম মাফিক পালন করা - যথারীতি খাজনা দেওয়া, আয়কর পরিশোধ করা, বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানি-টেলিফোন ইত্যাদি বিল সময়মতো পরিশোধ করা, পৌরকর প্রদান ইত্যাদি।

নাগরিকের পক্ষ থেকে এসব সরকারি দেয় সময়মতো এবং ঠিকমতো পরিশোধ হলে, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাদের 'উপরি' আশা করার 'স্কোপ' থাকবেনা। ব্যাংক, গৃহঋণ সংস্থা এবং অন্যান্য অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋন অনুমোদন করতে হলে এবং তা যথাসময়ে কিস্তিতে পরিশোধ করতে হলেও একটি নিয়মের মাধ্যমে চলতে হবে। অনুমোদনের জন্য নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করার সময়টি হাতে রাখতে হবে। অহেতুক তড়িঘড়ি করে, কর্মকর্তার 'অতিরিক্ত সার্ভিস' এর সুযোগ না করে দিলে কর্মকর্তা স্বয়ং অনিয়মে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারবেন না। যেখানে সম্ভব অটোমেশন বা কম্পিউটার পদ্ধতি চালু করতে হবে; ব্যক্তিবিশেষের সরাসরি হস্তক্ষেপ যত কম হবে কাজ তত দ্রুত এবং দক্ষ হবে; মেনিপুলেশন কমে যাবে। যে কোন তদবির এর স্কোপ কমাতে হবে। তদবির এর প্রাচুর্যহেতু তদবিরে তদবিরে প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং এর ফলাফল হয় অশুভ।

ছাত্রছাত্রীর ভর্তি এবং বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয় ও ঘোষনায় যে বিশাল অনিয়ম রয়েছে তা দূর করতে হবে। একটি উত্তম পদক্ষেপ ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে - উন্নত দেশগুলোর মতো গ্রেডিং সিষ্টেম চালু (বিভাগ এবং নম্বরের পরিবর্তে) এবং মেধানুসারে স্থান নির্ণয় বাতিল। আরো পদক্ষেপ প্রয়োজন (গ্রন্থটির অন্যত্র আলোচিত

হয়েছে)। এমনি বিভিন্ন স্তরে - শিক্ষাজীবনে, কর্মজীবনে, সমাজজীবনে, প্রশাসনে, রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশ গ্রহণে - আমাদের রীতিনীতি বা সিষ্টেম এবং অভ্যাস বা চর্চা বা প্রাক্‌টিসের আমূল পরিবর্তন দরকার। রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের দেশকে এখন আর 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র আখ্যা দেয়া হয় না বটে; আমরা অনুন্নত থেকে উন্নয়নশীল পর্যায়ে উন্নীত হয়েছি ঠিকই, কিন্তু সত্যিকার অর্থে, আমরা যে একটি সম্ভাবনাময় দেশের অধিকারী তার কতটুকু প্রমাণ দিতে পারছি আমাদের কাজেকর্মে? আমরা যারা প্রবাসে আছি, বিশেষ করে যেসব দেশে ঘুষ, উৎকচ, মিথ্যাচার তেমন নেই, যেসব দেশে আমাদের আয়কে সম্পূর্ণ 'হালাল' বিবেচনা করা হয়, যেসব দেশে আমাদের অনেকের বহুকাল কেটে গিয়েছে, তারা কি পারিনা, এসব দেশের কর্ম অভিজ্ঞতা, পরিবেশ ও উন্নত প্রযুক্তি বা টেকনোলোজির লব্ধ জ্ঞান থেকে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে?

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আসুন আমরা এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করি। আমরা কেউ দেশে ছুটি কাটাতে যাবার সময় বা একেবারে ফিরে যাবার সময় যেসব মালামাল নিয়ে যাই - তার একসেস্ ব্যাগেজ চার্জ বা অতিরিক্ত ওজন বহনের খরচ, শুল্ক বা অন্যান্য চার্জ যেন যথাযথভাবে প্রদান করি ব্যাংক বা নির্ধারিত সিদ্ধ পথে। আমরা কেউ যেন কাউকে উৎকচ না দেই- প্রয়োজনে কয়েক ঘন্টা বিলম্ব করবো এয়ারপোর্টে, অথবা পরে আরো দু'একদিন দৌড়াদৌড়ি করবো, তারপর মালামাল খারিজ করবো। সামর্থ্যে না কুলালে অতিরিক্ত ওজনের বা অধিক শুল্ক ও কর ধার্য হয় এমন জিনিষ তেমন নিবোনা সাথে।

এমনি আরো বহু পদক্ষেপ নিতে যদি আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই, 'সাহসী' হই, অনেক অনিয়ম ও অনাচার আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। সাধারণ নাগরিকেরা ও প্রবাসীরা দেশ সম্বন্ধে হতাশব্যাঞ্জক ধারণা পোষণের পরিবর্তে ধীরে ধীরে একটি সুখকর ও পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে সমৃদ্ধ স্বাধীন মাতৃভূমি গঠনে যার যার ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবো।

['মরুপলাশ', জুন, ২০০১। "দেশগঠনে প্রবাসীর কিছু দায় দায়িত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধের ঈষৎ পরিবর্তন/পরিবর্ধন।]

৩

দেশপ্রেম এবং দেশপ্রেমিকের চৈতন্য

প্রবাসে অবস্থান করে দেশপ্রেমের চিন্তায় মগ্ন হওয়াতে এবং দেশপ্রেমিকের কিছু কিছু কর্তব্য করাতে আত্মতুষ্টি মিলে। মাতৃভূমির সেবা করতে স্বদেশেই বাস করতে হবে এমন কথা নেই। বাংলাদেশের চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে দেশের ডাকে অনেক নাগরিক বিদেশে দায়িত্বপূর্ণ দেশপ্রেমিকের কাজ করেছেন, অথচ দেশের ভিতরে বাস করেও অনেক দেশবাসী স্বদেশপ্রেমের প্রমাণ রাখেননি, এমন নজিরের অভাব নেই।

সারা বছর দেশের জন্য আমরা কে কি কাজ করেছি, চিন্তা করেছি, লিখেছি, জনসমক্ষে বলেছি, অন্যকে বুঝিয়েছি, তার মাঝে মধ্যে খতিয়ান হওয়া দরকার।

দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে আমরা বিভিন্ন মহলে কতটা ভূমিকা রাখি। সার্বভৌম মাতৃভূমিকে অপর কোন শক্তি আচ্ছাদন করে ফেলতে যাতে না পারে, তার প্রস্তুতি পূর্বাহ্নে নিতে হবে যুব সমাজকে - তাদের চিন্তা-চেতনায় জাগিয়ে রাখতে হবে দেশপ্রেমের মহত্ত্ব।

আমাদের আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে যাচাই করতে হবে প্রবাসেও আমরা কে কতটুক ভূমিকা রাখতে পেরেছি, যথা- প্রবাসের বাংলাদেশী সংগঠনগুলোকে কতটুকু এবং কীভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছি- ব্যক্তিগত অংশগ্রহণের মাধ্যমে, না আর্থিক সমর্থন দিয়ে, -নাকি শুধু নিজেকে নিয়ে নিজের পেশায়ই ব্যস্ত রয়েছি সারাক্ষণ। এখানকার পত্রপত্রিকায়, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বিভিন্ন সংগঠনে পেরেছি কি কিছু ভূমিকা রাখতে? পেরেছি কি দেশের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে ? না কি ভুলেই গিয়েছি সবকিছু - আর যাবোনা ফিরে, এই প্রতিজ্ঞায়! কে যায় সেখানে, এই দ্বন্দ্বে ?

আমাদের মধ্যে যারা ক্ষাণিকটা সুপ্রতিষ্ঠিত, অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন, তাদের ক'জন ভাবি ভাগ্যহীনদের নিয়ে, যারা আমাদের চেয়ে কম সুযোগ সুবিধায় আছেন! একটি সুনির্দিষ্ট পথে ও ব্যক্তি মানসের বিকাশে বা গোটা জাতির উন্নতিতে অংশ নিতে গিয়ে যেসব প্রতিবন্ধকতা প্রতিভাত হয়, তার একটি বড় অধ্যায়কে অতিক্রম করাই দেশপ্রেমিকের কর্তব্য। সামনে স্বভাবতঃই থাকতে পারে কঠিন, কন্টকাকীর্ণ পরিবেশ। তা লাঘব করিয়ে সবকিছুকে আরো সামনে নিয়ে যাবার জন্য চাই স্বদেশে অনুকূল পরিবেশ - বাকস্বাধীনতা, আইনের শাসন, কম রেষারেষি, খোলামন। এ সবের সৃষ্টিতে অবদান রাখাও দেশপ্রেম। শুধু গর্ব করাই হতে পারেনা সার্বভৌম দেশের নাগরিকের বড় সম্বল। কর্তব্যবোধ, দায়িত্বের সাথে জাতীয়

বিষয়গুলো অনুভব করা, দেশকে উন্নত অবস্থায় টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর হওয়া - এসবের নামও দেশপ্রেম।

দেশে আইনানুগ প্রথায় বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ, প্রবাসে যার যার কর্তৃপক্ষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে উৎকৃষ্টমানের দায়িত্বপালনের মাধ্যমে সেবা করা এবং সুনাম অর্জন করা, নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদান রাখা এবং ফিরে গিয়ে এসব ক্ষেত্রে স্বদেশেও কিছু ভূমিকা রাখা -- এসবই হোক প্রবাসে বসে দেশপ্রেমের কাজ। আমাদের বিশ্বাস রাখা দরকার, দূরে অবস্থান করেও দেশের জন্য অধিক দরদ দিয়ে অনেক কিছু অনুধাবন করা সম্ভব ; out of sight মানেই যেন out of mind না হয়।

আড়াইশো' বছর পূর্বে জনৈক ইংরেজ লেখক তার 'Of Men and Matters'- এ বলেছিলেন 'The proper means of increasing the love we bear our native country is to reside some time in a foreign one' (উইলিয়াম শেণ্‌ষ্টোন)। অর্থাৎ, 'আমাদের মাতৃভূমির জন্য ভালোবাসা বাড়াবার উত্তম উপায় হচ্ছে কিছুকাল প্রবাস যাপন করা'। একই সুরে বিখ্যাত ফরাসী লেখিকা, মাদাম দ্যা স্তায়েল, প্রায় দুশ' বছর আগে বলে গিয়েছেন - 'The more I see of other countries, the more I love my own'। অর্থাৎ, 'আমি যত বেশী অন্যান্য দেশ দর্শন করি, ততই ভালোবাসি আমার নিজের দেশকে'। সেদিক থেকে আমরা প্রবাসীরা দেশকে আরো ভালোভাবে জানতে এবং দেশের জন্য অধিকতর মমত্ববোধ জাগাতে সক্ষম।

আজ আমরা সম্পূর্ণ জাতিসত্ত্বা নিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক- এক জাতি, বাঙালি আমরা; একভাষা, বাংলাভাষা আমাদের - এর চেয়ে বড় তৃপ্তির আর কী হতে পারে প্রবাসে একজন দেশপ্রেমিকের?

সব দেশপ্রেমিকের একাগ্র ইচ্ছা থাকলে, উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া আগের চেয়ে হবে সহজতর এবং দ্রুততর। প্রমাণ ইতোমধ্যেই কিছু কিছু পরিলক্ষিত হচ্ছে, যেমন - দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে উন্নতি, বিদেশে কর্মরত জনশক্তির প্রসার, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের সক্রিয় পরিচিতি এবং ভাবমূর্তি বৃদ্ধি, তা সে জাতিসংঘের শক্তিশালী নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদলাভে হোক, কিংবা জোটনিরপেক্ষ সংঘে হউক বা শান্তি মিশনের সদস্য হিসাবে হউক। এমনকি, মাতৃভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষায় স্থান করে দেয়ার অগ্রণী ভূমিকাও আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশই পালন করে। পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যত ভাষাভাষী ছোটবড় দেশ রয়েছে, তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাষাকে প্রতিবছর সকলের সাথে একটি বিশেষ দিনে - ২১শে ফেব্রুয়ারিতে - স্মরণ করতে পারবে, এজন্য তারা বাংলাদেশের কাছে ঋণী।

মাতৃভাষাকে একটি সম্মানজনক আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে বাংলাদেশের তুলনা নেই। প্রতিটি বাংলাদেশী দেশপ্রেমিকের জন্য এটা গর্বের বিষয়। এ ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিশ্বে মাতৃভাষাকে উঁচুস্থানে স্বীকৃতির ব্যবস্থা করে দেবার জন্য যে প্রারম্ভিক ভূমিকা তাও পালন করেন কানাডা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্সে অবস্থানকারী কতিপয় প্রবাসী বাংলাদেশী। ** এই কাজটিও দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঐসব প্রবাসী বড় মাপের দেশপ্রেমিক বৈ কি!

[**বিশেষ করে কানাডা প্রবাসী দুইজন উৎসাহী বাংলাদেশীর (আবদুস সালাম ও রফিকুল ইসলাম) অগ্রণী ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এদের শুরু করা 'মাদার ল্যাংগুয়েজেস্ অব দ্যা ওয়ার্ল্ড' সংস্থাটির মাধ্যমে তৎপরতার কারণেই ১৯৯৮ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষনায় ইউনেস্কো এবং জাতিসংঘ অনুমতি দেয়। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো তার তিরিশতম অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তাব প্যারিসে গ্রহণ করে] ['মরুপলাশ', চতুর্দশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০০১]।

৪

বিজয় দিবস ঃ আত্মশুদ্ধির সময়

যে কোন বিজয়ই আনন্দের এবং গর্বের। তা হোক না কোন পরীক্ষার ফলাফলের, ক্রীড়া বা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বা কোন যুদ্ধক্ষেত্রের, কিংবা কোন নির্বাচনের বিজয়লাভ। আর তা যদি হয় একটি গোটা জাতির, একটি কৃত্রিম কল্যাণবিমুখ অপশক্তির নাগপাশ থেকে মুক্তি, যদি হয় একটি স্বাধীনচেতা অথচ অবরুদ্ধ দেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা অর্জনের চূড়ান্ত মূহুর্ত, যদি সেই সময়টি হয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচবার মতো একটি বহু প্রতীক্ষিত দিবস, তাহলে তাকে স্মরণ করবার জন্য আমাদের অপার আনন্দ তো হবেই।

একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাত থেকে ষোলই ডিসেম্বরের সকাল পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশীর যে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থান, বহু ত্যাগের বিনিময়ে যে যুদ্ধ, অবশেষে সত্যের জয় যে হয়ই, অসত্য কোন না কোন সময় যে প্রত্যাখ্যাত হতে বাধ্য - এই নির্মম বাস্তবতা আমরা উপলব্ধি করেছি। আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সরাসরি অবদানের মাধ্যমে যে জয়লাভ, তাকে স্বার্থান্বেষী ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র এবং দুর্দন্ড প্রতাপ শত্রুসেনার আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেনি।

কেন এই দীর্ঘ নয়মাস সশস্ত্র যুদ্ধ, কেন শান্তিপ্রিয় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিমনা সরলপ্রাণ নিরীহ বাঙালি তাদের কঠোর প্রতিজ্ঞায় হয়ে উঠলো তৎপর, সে ইতিহাসের অবতারনা আজ করবো না।

সেই প্রতারণাকারী, সুযোগ-সুবিধা উপভোগী, অন্যদের ন্যায্য অধিকারকে বারম্বার প্রবঞ্চনাকারী তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক আচরনের কথা সবাই জানেন। আজকের এই সভায় নিশ্চয়ই আমার মতো অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যাষ্ঠ কিছু কিছু লোকের চোখের সামনে সেসব বৈষম্য এবং অবিচার স্পষ্টতর হয়ে ভাসবে। সেগুলো কখনো ভুলে যাবার নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বের তিনটি বছর করাচিতে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি স্পর্শকাতর বিভাগে (তথ্যমন্ত্রনালয়ের এক্সটার্নাল সার্ভিসেস বিভাগে) দায়িত্বপূর্ণ পদে চাকুরীরত অবস্থায় সেই বৈষম্য প্রত্যক্ষ করার দুর্ভাগ্য হয়েছিলো আমার। আমার ক্ষুদ্র চেষ্টায় বহু কষ্টে তখন বাধ্য করেছিলাম পাঞ্জাবী বস্‌কে, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কিছু তত্ত্ব, তথ্য ও পরিচিতি বর্হিবিশ্বে ষোলটি দেশে নিয়মিত প্রচার করার ক্ষেত্রে। কিন্তু ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ এর তেইশ বছরের শেষের মাত্র তিনবছর সময় আমার এই কাজের জন্য যথেষ্ট ছিলো না। অন্যত্র আমার মতো অনেক সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, কুটনীতিক নিশ্চয়ই স্বাধিকারের তাগিদে নিজ নিজ সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও তদানীন্তন

পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছিলেন আর ঢাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ইশারা চুপচাপ অনুসরন করে যাচ্ছিলেন।

১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ় মনোবল, সদিচ্ছা, ঐক্য বজায় ছিলো বলে প্রচণ্ড ক্ষমতাবান পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে পেরেছিলো বাঙালি। তারা পেরেছিলো বিশ্বের দরবারে সার্থকতার সাথে সত্যিকারের চিত্র তুলে ধরতে। আমি নিজে পেশাগত কাজের মাঝেও মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়ায় একাত্তরের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর এর আড়াইমাস সময় ঘুরে ঘুরে আমাদের স্বাধীনতার সপক্ষে কিছু কিছু মহলে ধারনা দিতে পেরেছিলাম বলে নিজেকে ধন্য মনে করি।

সেসব দেশের সংবাদপত্র বা অন্যান্য গণমাধ্যম, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন, কিছু পেশাজীবী সংগঠন- এদের মধ্যে একাত্তরের মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত ঢাকায় সচক্ষে দেখে আসা বীভৎস দৃশ্যের এবং ঘটনাবলীর কথা যখন অবতারনা করতাম, তখন সেই সীমিত সংখ্যক বিদেশী বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তান ও তাদের দোসরদের কার্যকলাপের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে পাকিস্তানীদের প্রচারিত কথাঃ "পূর্ব পাকিস্তানে সব কিছু নর্মাল" এই মিথ্যা প্রচারে আর কান দিতো না কেউ। আমাদের কিছু কিছু কুটনীতিক (সবাই নন) আমাকে ও আমার বিদেশী বন্ধুদের নেপথ্যে যথেষ্ট সহায়তা ও নিরাপত্তা দান করেন। অবশ্য আমার স্বাধীনতার সপক্ষে কার্যাবলীর জন্য অক্টোবর- শেষে দেশে ফিরে ডিসেম্বরের বিজয় দিবস পর্যন্ত সময়টি আমার এবং আমার পরিবারের কাউকে কাউকে অশান্তি, অস্থিরতা ও আতংকের মাঝে কাটাতে হয়েছে; হয়রানীও হতে হয়েছে একাধিকবার। সেসব কথা থাক আজ।

আমার চেয়ে বেশী, যেসব মুক্তিযোদ্ধা বাড়ীঘর আত্মীয়স্বজন ছেড়ে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন নানা অসুবিধার মধ্যে, যেসব বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতজন গুলীর শিকার হয়ে আর আমাদের মাঝে নেই আজ, তাদের সবাই আমাদের শ্রদ্ধা ও গর্বের পাত্র। তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করা ছাড়াও আমরা পারি আরো প্রত্যয়ী হতে, যাতে তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা, তাদের বিজয় আমরা সত্যিকার অর্থে রক্ষা করতে পারি; পারি যেন অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সূচনা করে নতুন প্রজন্মের মুখে হাসি ফোঁটাতে।

আজ দেশের দিকে তাকালে দুঃখ হয়। ঠিক যে ভাবে সবাই দেশকে দেখতে চায় সেই ভাবে গত তিন দশক পায়নি, এখনো পাচ্ছে না। অবশ্য ১৯৭১ এর পর আমরা অনেক ক্ষেত্রেই উন্নতি সাধন করেছি, আশাপ্রদভাবে না হলেও। আমার কথা, দেশের উন্নতির মূল চাবিকাঠি আমাদের হাতেই। দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করানোতে, অস্থিরতা বন্ধ করাতে, উন্নয়নকাজে নিয়োজিত থাকবার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং বিশ্বের মাঝে আমাদের

যথাযোগ্য স্থান করে নিতে পারি আমরা নিজেরাই। সরকারের একার পক্ষে এ সব সাধন সম্ভব নয়, যদি সবার সহমর্মিতা, সহযোগিতা না থাকে। প্রত্যেক সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করবে ভালো কাজের জন্যে, নিজেরা টিকে থাকার জন্যও, কিন্তু সেই সাথে বিরোধী দলের ভূমিকা থাকতে হবে -- জাতি গঠনে অংশ গ্রহণ করতে এবং সহযোগীর ভূমিকায় নামতে, -- তা যেন না থাকে শুধু বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতাতেই সীমাবদ্ধ।

আজকের ঘন ঘন লাগাতার হরতাল যেন একটি অশুভ কালচারে পরিণত হয়েছে। কী এবং কতটা জানমাল ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে সেই দিকে যেন কারো ভ্রুক্ষেপ নেই। সরকারেরও উচিত হবে যথাসম্ভব সমঝোতার ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে মূল বিষয়গুলোর সমাধান করা। উভয়েই একগুঁয়েমি করে নিজ নিজ কোর্টে অবস্থান করলে বলটি মাঝখানেই থেকে যাবে। কারো পক্ষেই গোল করা সম্ভব হবে না। আশার কথা, সবই অন্ধকার নয়। কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য কৃতকার্যতা আমাদের দেশে অর্জন করা হয়েছে - শান্তি চুক্তি; পানি চুক্তি; নীরক্ষরতা দূরীকরণে ৫৬% পর্যন্ত অর্জন (যা আগামী পাঁচ বছরে ৯০% ভাগে উন্নীত হতে পারে), খাদ্য ঘাটতি কমানো, ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

এছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইমেজ বা ভাবমূর্তির উন্নয়ন হয়েছে যথেষ্ট - নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ লাভ, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ২০০০ সন থেকে “বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস” হিসাবে স্বীকৃতিলাভ; ২০০১ সনে ঢাকাকে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর শীর্ষ সম্মেলনের স্থান নির্ণয়; মধ্যপ্রাচ্য ও বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী শ্রমিক ও পেশাজীবীদের অধিক গ্রহণযোগ্যতা - যার প্রমাণ, গত কয়েক বছরে এক্ষেত্রে প্রচুর পরিমানে বৃদ্ধি এবং যার ফলস্বরূপ আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ঘাট্‌তি মোচন ধীরে ধীরে সম্ভব হচ্ছে।

আজকের বিজয় দিবসে এবং আগামী বিজয় দিবসগুলোতে আমাদের লক্ষ্য হতে হবে - পূর্ববর্তী এক বছরে আমরা কী কী সফলতা অর্জন করেছি, কোথায় কোথায় ব্যর্থতা ঘটেছে, সেখানে আরো অর্জন করা গেলো না কেন, খুব শীঘ্র তার উন্নতি করা সম্ভব কিনা- এসব পর্যালোচনা করে আত্মশুদ্ধির ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেদের শোধরাতে হবে।

তিরিশ লক্ষ শহীদানের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশে তখনই সত্যিকারের বিজয় সূচিত হবে - যখন নিজেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত একটি কোন্দলবিহীন ও উন্নত সমাজ আমরা সৃষ্টি করতে পারবো। আসুন আজকের ২৮তম বিজয় দিবস পূর্তিতে আমরা আরেকবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই - স্বাধীন বাংলাদেশকে সবাই মিলে বঙ্গবন্ধুর “সোনার বাংলা” হিসাবে যেন গড়ে তুলতে পারি।

[ষোলই ডিসেম্বর '৯৯ বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ আয়োজিত বিজয় দিবস শীর্ষক আলোচনা সভায় লেখকের লিখিত বক্তব্য, পরবর্তীতে 'মরুপলাশ'-এ মুদ্রিত। ১৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৯৯৯]।

৫

বাঙালি ও বাংলাদেশী

প্রবাসের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কয়েকটি শব্দ ও ধারণা বা concept নিয়ে প্রায়ই আলোচনা শোনা যায়। কোন্‌টি সঠিক, কোন্‌টি অশুদ্ধ, কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য, কোন্‌টি বর্জনীয় - এ নিয়ে থাকে মতভেদ। এমনি দুটি শব্দ বারম্বার উচ্চারিত হয় আমাদের জাতীয়তা প্রসঙ্গে - আমরা বাঙালি না বাংলাদেশী।

এক কথায় আমি কোনটিকেই অশুদ্ধ বলবো না, কোনটিকেই বর্জনীয় মনে করবো না। তবে ক্ষেত্র বিশেষ একটির প্রয়োগ আরেকটির চেয়ে কিছু বেশী বা একটি আরেকটির চেয়ে একটু অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

সাংস্কৃতিক জাতীয়তা সুত্রে আমরা অবশ্যই বাঙালি। আমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য বাঙালিত্বে ভরপুর। রাষ্ট্রীয় পরিচয়কে জাতীয়তার পরিচয়বাহক ধরে নিলে, জাতের পরিচয়কে গৌণ করা হয়; আবার জাতের পরিচয়কে প্রাধান্য দিলে, রাষ্ট্রের পরিচয় ক্ষুন্ন হয়। শুধু বাংলাদেশী বলে দাবী উত্থাপন করলে অনেকাংশে আমাদের বাঙালিত্বকে হেয় করা হবে। আবার শুধু জাতির পরিচয়ে পরিচিত হতে চাইলে, রাষ্ট্রীয় পরিচয়কে পার্শ্ববর্তী দেশের প্রতি পরোক্ষভাবে যৎসামান্য হলেও দুর্বলতা দেখানো হবে বলে অনেকে ধারণা করেন। শুধু তাই নয়। শেষোক্ত অবস্থানে আবার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের কথাও এসে যায়। বিশ্বের সব বাঙালির মধ্যে দুটো প্রধান ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠি প্রায় সমানভাবে বিস্তৃত - আমাদের দেশে মুসলমান-প্রধান বাঙালি, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যত্র হিন্দু-প্রধান বাঙালি। উভয় এলাকায়ই কিছু খৃষ্টান বৌদ্ধও রয়েছে বাঙালি।

আমাদের স্বাধীনতার পর প্রাক্তন ভারতীয় ও পরবর্তিতে পাকিস্তানী নাগরিক হিসাবে উত্তরসূরীর পরিচয় নিয়ে আমরা নতুন নাগরিক হিসাবে গর্বিত বাংলাদেশী। আমাদের পাসপোর্টে উল্লেখ থাকে বাংলাদেশী হিসাবে। বিদেশে আমাদের অফিসিয়াল পরিচয় আমরা বাংলাদেশী।

কিন্তু আমরা কি তাহলে বাঙালি না ? বৃটিশ পাসপোর্টধারীরা যেমন ইংলিশ, স্কটিশ, আইরিশ, ওয়েল্‌শ ইত্যাদি; ভারতীয়রা যেমন বাঙালি, পাঞ্জাবী, মারাঠি, মাদ্রাজি, গুজরাটি; পাকিস্তানীরা যেমন সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পাঠান, ইত্যাদি; আমরা বাংলাদেশীরা তেমন বাঙালি। বলা যেতে পারে, আমরা সম্ভবতঃ আরেকটু বিরল এবং স্পষ্টতর অবস্থান অধিকার করে আছি - বাংলাদেশী নাগরিকেরা মূলতঃ কেবলই বাঙালি। আমরা একটি জাতেরই অধিবাসী - এ এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাতীয়তা বৈ কি ? অর্থাৎ আমরা প্রত্যেক বাংলাদেশীই বাঙালি, যদিও বিশ্বের প্রত্যেক বাঙালি বাংলাদেশী নয়।

এবারে আসা যাক আমাদের সাংবিধানিক ব্যাখ্যায়। সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৩ এবং জাতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক অনুচ্ছেদ ২৩ অনুযায়ী আমরা জাতীয়তাবাদের পরিচয়ে বাঙালি। কিন্তু অপরদিকে সংবিধানের ৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাগরিকত্ব বা নাগরিকগণের পরিচিতির স্বীকৃতিতে আমরা বাংলাদেশী। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটানো হলেও আমরা বাঙালি। ৩ এবং ২৩ অনুচ্ছেদে বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বীকৃতি রয়েছে। এর একটি কারণ, বেআইনী সামরিক শাসন আমলের যেসব সংশোধনী আছে সুপ্রীম কোর্ট ইচ্ছে করলে তা বাতিল করতে পারেন। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন প্রমুখের ব্যাখ্যায় যেহেতু সংস্কৃতি সম্পর্কিত ২৩ অনুচ্ছেদের পরিবর্তন হয়নি, সেহেতু কোন সরকার 'বাঙালি' শব্দটির পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' শব্দটি প্রয়োগ করলেও জাতীয়তাবাদ বলতে বাঙালিই বোঝায়।

উল্লেখ্য, ৩ অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত এবং ২৩ অনুচ্ছেদ জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কিত। শেষোক্ত অনুচ্ছেদে রয়েছে - রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলা সমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখবার ও অংশগ্রহণ করবার সুযোগলাভ করতে পারে। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এরূপ সাংস্কৃতিকসূত্রে আমরা বাঙালি। ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট আমরা বাঙালি জাতি।

অপরদিকে, আমরা স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে যেই নতুন দেশটির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছি সেই দেশটির প্রতিনিয়ত স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদর্শনের জন্যও বাংলাদেশী হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতে পারি। পাসপোর্টে, নাগরিকত্বে এবং দেশের পরিচয়ে আমরা বাংলাদেশী। এতে আমাদের মূল জাতীয়তা, কৃষ্টিও সংস্কৃতির সাথে অভিন্ন যে যোগসূত্র, তাতে আমরা অনাদিকাল ধরে বাঙালিই। বৃটিশ, আমেরিকান, কানাডীয়ান, অষ্ট্রেলিয়ান - যেই

নাগরিকত্বই আমরা জীবিকা ও বাসস্থানের কারণে গ্রহণ করি না কেন, জাতে আমরা থাকবো বাঙালি। বাংলাদেশী হিসাবে আমাদের অতি অল্পসংখ্যক হলেও কিছু নাগরিক এখনো উর্দুভাষী থাকতে পারে - নানা কারণে; কোন কোন অধিবাসী জন্মসূত্রে বাংলাদেশী হলেও অথবা তাদের পিতামাতার ভিন্নদেশী নাগরিকত্ব থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেরা, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের ঐ নগণ্য সংখ্যক উর্দুভাষী, পাসপোর্টে কখনো বাংলাদেশী পরিচয় দেবার সুযোগ পেলেও তারা বাঙালির পরিচয় বহন করতে পারবে না।

বাঙালি এবং বাংলাদেশী কোথাও অভিন্ন এবং সমার্থক, কোথাও বা অনেক পৃথক, অনেক ভিন্ন সত্ত্বের।

একটু অন্য প্রসঙ্গ তুলছি। “বাংলাদেশ” ইংরেজিতে এক শব্দে লিখিত হয় শুদ্ধভাবে। “বাংলা” “দেশ” এই দুই শব্দে বিভক্ত করে প্রয়োগ অশুদ্ধ। স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরও কোথাও কোথাও, এমনকি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গ্রন্থেও আমাদের কর্তৃপক্ষ এবং বুদ্ধিজীবীদের নিশ্চুপ থাকার কারণে ইংরেজীতে ত্রুটিপূর্ণ “বাংলা” “দেশ” এই দুইশব্দে প্রিয়দেশের নামটি বেমালুম ব্যবহৃত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সকলের সজাগ দৃষ্টি এখানেও নিবদ্ধ থাকা দরকার। তবেই না আমরা সচেতন দেশপ্রেমিক, “বাংলাদেশী”!

[উল্লেখ্য, বিশ্ববিখ্যাত এবং বহুল প্রচারিত New International Webster's Comprehensive Dictionary (পৃঃ ১১১), প্রায় দুই হাজার পৃষ্ঠার অভিধানটিতে দুই শব্দে Bangla Desh উদ্বৃতি দেয়া আছে। এর প্রকাশ কাল ১৯৯৬ সনে। বর্তমান প্রবন্ধকার দুই পৃষ্ঠাসম্বলিত এক প্রতিবাদ জানালে, তারা দুঃখ প্রকাশ করে, পরবর্তী সংস্করণে এর সংশোধনীর আশ্বাস দিয়েছে।]

[‘প্রভা’ সংখ্যা ১৬, শ্রাবণ ১৪০৭ বাংলা]

৬

বাংলাদেশী সংস্কৃতি - প্রবাসে এর চর্চা

একটি দেশ বা জাতি সার্বিকভাবে কতটা উন্নত তার অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে সেদেশের সাংস্কৃতিক মাধ্যম। এই কাঠামো কতটা শক্ত এবং কত বিস্তৃত হওয়া দরকার তার কিছু এখানে আলোচিত হলো।

সভ্যতার নীতি নির্ধারণ কখনো সংস্কৃতির উন্নতি বাদ দিয়ে হতে পারে না। সাংস্কৃতিক দৈন্যতা থাকলে শুধু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অগ্রসরতা দেখিয়ে কোন দেশই বেশীদিন তার প্রভাব টিকিয়ে রাখতে পারে না। কৃষ্টি এবং ঐতিহ্য সংস্কৃতির অংশ। সংস্কৃতি তার নিজের ধারাতেই চলে। তবু পারিপার্শ্বিক অবস্থান, বহিঃর্বিশ্ব, পরিবেশ, বর্তমানের প্রভাব বিস্তারকারী ভাবধারা -- এসবই এসে উদ্ভাসিত হয় সংস্কৃতির উপধারাকে সমৃদ্ধ করতে অথবা খর্ব করতে।

যে সংস্কৃতির অবকাঠামো যত মজবুত, সেখানে উপধারাগুলোর প্রভাব-জাল তত বিস্তৃত। অর্থাৎ সমৃদ্ধ সংস্কৃতি তো শিল্প, ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, দেশীয় আচার আচরণ, ইত্যাদির আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক চর্চা, এসবের সুশৃংখল সংমিশ্রণ। আর অপসংস্কৃতি হচ্ছে এসবের জগাখিচুড়ি অথবা অনাকাঙ্ক্ষিত সংস্করণ অথবা বিজাতীয় সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ অথবা কোনো বিশেষ একটি কৃত্রিম সংস্কৃতির প্রতি গোঁড়ামি।

প্রবাসে দেশীয় সংস্কৃতির অনুপস্থিতি বা খণ্ড খণ্ড সময়েও তার চর্চা বা উপভোগ করবার অভাব ভীষণভাবে অনুভূত হয়। বস্তুত কখনো কখনো এটা প্রবল আকার নিয়ে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে "কালচারাল শক" বলে যে একটি কথা আছে তার শিকারে ফেলে। এতে প্রবাসীর কর্মদক্ষতা কমতে পারে, তার দুশ্চিন্তা বাড়াতে পারে এবং তাকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগাতে পারে।

অথচ প্রবাসে বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে--যেমন নববর্ষের দিনটিতে কিছু গান-বাজনা, সামান্য সাহিত্যচর্চা যে কত কাম্য হতে পারে, তা যে কতটা মন ভরিয়ে দেয়, কর্মজীবনের একঘেয়েমিতে কতটা বৈচিত্র্য আনে, তা প্রবাসীমাত্রই ভালো করে উপলব্ধি করতে পারেন। যে বিষয়টি অনেক সময় প্রত্যক্ষভাবে প্রতিভাত হয় না, সেটি হচ্ছে একই সাথে যে মাতৃভূমির স্মৃতিজাগরণে স্বদেশের শিল্প সম্ভারের সেবায় নিজেদেরকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা । প্রবাসেও এভাবে স্বদেশের কৃষ্টি-ঐতিহ্যকে ধরে রাখা হচ্ছে এবং সামান্যভাবে হলেও বহিঃর্বিশ্বে তার কিছু প্রচার হচ্ছে।

আমাদের সংস্কৃতিতে আমরা গর্ববোধ করবো কেন, এর ধারাই বা কি? একটু ইতিহাসের দিকে তাকাই -- রাঢ় বঙ্গ বরেন্দ্র এবং গৌড় নিয়ে প্রাচীনকালের হাজার বছর পূর্বের যে ভূখণ্ড বা তারপর বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা আসাম নিয়ে এককালের যে বেঙ্গল বা বংগ, যা পরবর্তীতে পূর্ববঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান, সর্বশেষে তাই আজকের এই বাংলাদেশ।

একে একে এই বর্ণাঢ্য, সমৃদ্ধ অঞ্চলের আকর্ষণ গুপ্তরা বা অষ্টম শতকের পালরা বা তারপর দিল্লীর তুঘলকেরা এবং তারও পরে মুঘলেরা কেউই এড়াতে পারেনি। চৌদ্দশত শতকের মাঝামাঝি এবং এখন থেকে ছয়শ’ বছরেরও আগে, সামছুদ্দীন ইলিয়াস শাহের সময় (১৩৪২-৫৭) আশেপাশের সমস্ত এলাকাকে একত্র করে প্রথমবারের মতো নামকরণ হয় “বাঙলা”। সেই আমলের তিনটি প্রদেশ - লক্ষ্মৌতি, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও মিলে ব্রিটিশরাজ্যের শুরু পর্যন্ত এবং তারপরও ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ বা ১৯১১ এর বঙ্গভঙ্গ রোধ, বিহার-উড়িষ্যা পৃথকীকরণ, এসবের পর পশ্চিমবঙ্গে চলে যায় প্রাচীন রাঢ় এবং গৌড় এলাকা, আর পূর্ববঙ্গের বা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয় প্রাচীন বরেন্দ্র, বঙ্গ এবং সমতট এলাকা।
এইভাবে বাঙালির উদ্ভব দ্রাবিড় - মঙ্গোলীয় থেকে হলেও পরবর্তীতে মুসলমান প্রভাবে বহু আফগান, ফার্সি, তুর্কি এদেশে আসে, তাদের সাথে আসে বহু সুফি সন্ন্যাসী বা ইসলাম প্রচারের জ্ঞানীগুণী। আমাদের সংস্কৃতিতে তাই হিন্দু মুসলমানের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ থাকবেই।

সাহিত্য ও বাংলা ভাষার মধ্যে সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালির সাথে সাথে প্রভাব রয়েছে ফার্সি, আরবি প্রভৃতি মুসলমানি ভাষারও।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ধর্ম অন্তরায় না হয়ে সংস্কৃতি সেবার সহায়ক বা সম্পূরকও হতে পারে - গোঁড়ামিমুক্ত হলেই। আমরা সংস্কৃতি বা জাতিতে একদিকে যেমন বাঙালি, রাষ্ট্রীয়ভাবে বা জাতীয়তায় আমরা বাংলাদেশীও। আমাদের সংস্কৃতিতে যেমন হিন্দু মুসলমান বা অন্য সম্প্রদায়েরও ভাবধারার কিছু সংমিশ্রণ থাকতে পারে, তেমনি এখানকার মুলসমানদের কর্মধারায়ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব থাকতেই পারে এবং এই দুই ধারার সুষ্ঠু ও সংঘাতবিহীন যতটুকু সমন্বিত ও সর্বজনগৃহিত সংস্কৃতি, তাই বাংলাদেশী সংস্কৃতি। একে কৃত্রিমভাবে বা আইন করে চাপিয়ে দেয়া যায় না, স্বতঃস্ফুর্তভাবে আপনা থেকেই বাংলাদেশী সংস্কৃতির উদ্ভব হতে হবে। মনে রাখতে হবে একসময়ের ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা সেই সোনার বাংলার সংস্কৃতিও ছিল অনেক সমৃদ্ধ। আজ যেন এর বিলুপ্তি না ঘটে, অপসংস্কৃতি এসে যেন জায়গা জুড়ে না নেয় বা বিজাতীয় সংস্কৃতিও যেন এসে মাত্রাধিক প্রভাবিত না করে।

*   *   *   *

আমরা যেমন অবশ্যই আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে প্রবাসে নাগরিক জীবনের বা আধুনিক জীবনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করবোনা বা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখার নাম করে পান্তাভাত বা অমনকিছু খাওয়াবার বা মেঝেতে বা পাটিতে বসিয়ে খাবারের বাধ্যবাধকতা করবোনা; আমরা চেয়ার টেবিলে বসেই প্রয়োজনীয় খাবার খাওয়াবো, আধুনিকতার সাথে সংযোগ রক্ষা করবো। তবে আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে মা, বাবা ডাকার বদলে আম্মা, আব্বা ডাকলেও মাম্মি-ড্যাডি ডাকতে যেন উদ্বুদ্ধ না করি।

মোটকথা, বাঙালি সংস্কৃতি তথা বাংলাদেশী সংস্কৃতি মানে যা কিছু পাশ্চাত্যের বা যা কিছু হিন্দুয়ানি তাই বর্জন বা গ্রহণ নয়, আবার যা কিছু ইসলামি প্রতীক বহন করবে, তারই পালন বা প্রত্যাখ্যান নয়। আগেই বলেছি, আমাদের বাংলাদেশী সংস্কৃতিকে একদিকে যেমন ব্রিটিশ বা পাকিস্তানীদের চাপিয়ে দেয়া অপসংস্কৃতি বা ধর্মান্ধ, স্বাধীনতা বিরোধীচক্রের গোঁড়ামিভরা সংস্কৃতি থেকে মুক্ত রাখতে হবে, অপরদিকে তেমনি পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক সংস্কৃতি বা পশ্চিমবঙ্গীয় উদ্ভূত বাঙালি সংস্কৃতি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আমাদের সমৃদ্ধ বাংলাদেশী সংস্কৃতির স্বকীয়তা রক্ষা করতে হবে। আমরা যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, স্বল্প কাজেই পরের প্রত্যাশা না করি, পরের অনুকরণে গর্ববোধ না করি।

সংস্কৃতির সেবা প্রবাসে সেদিনই সার্থক হবে যেদিন দলমত নির্বিশেষে সবাই মিলে বিভিন্ন দিনে খণ্ডখণ্ডভাবে হলেও এক একটিতে অন্তত বেশ কিছু সংখ্যক প্রবাসী উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করতে পারবো -- যাতে রিয়াদ প্রবাসী তিনলাখ বাংলাদেশীর অন্তত ১০% বা তিরিশ হাজার লোক ভাগে ভাগে দশ পনেরটি অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারে এবং অতি সমৃদ্ধ ও তৃপ্তিদায়ক বাংলাদেশী সংস্কৃতির স্বাদ পুনরায় পেতে পারে। সার্বজনীন আবেদন রাখতে পারে এমন অনুষ্ঠান যত সীমিত বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবীদের গণ্ডির বাইরে পৌঁছবে ততই উত্তম; ততই দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নে সর্বস্তরের পরিশ্রমী প্রবাসীদের মনতুষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

['প্রভা', ৭ম বর্ষ ১৫তম সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৯৯]

৭

নববর্ষ এবং প্রবাসে বাংলাদেশী সংস্কৃতির চর্চা

নববর্ষ আসলেই, বস্তুত চৈত্র শেষ না হতেই, বাংলা তারিখ সম্বন্ধে প্রতিটি বাঙালির মনে একবার করে উঁকি দেয় দেশীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির স্মৃতি। অবশ্য কত জনই বা মনে রাখেন বাংলা সনের! প্রবাসে বাঙালির কর্মজীবনে, ভিন্নতর পরিবেশে, অনেকটা সবার অগোচরে অতিক্রান্ত হয়ে যায় বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটি। তবু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বাঙালি জনগোষ্ঠী পরিবিষ্ট সৌদিতে, অর্থাৎ এই মরুভূমির দেশটিতেও, কিছু কিছু অনুষ্ঠানমালার আয়োজন হয় বৈ কি ! মনে করা হয়, সৌদিতে চুয়ান্ন লক্ষ বিদেশীর (১৯৯৮ সনের হিসাব অনুযায়ী) মধ্যে প্রায় ১৪% বা সাড়ে সাত লাখ লোক বাঙালি সংস্কৃতির আওতাভুক্ত। এই সংখ্যাটি নেহায়েত কম নয়, বরঞ্চ আশেপাশের দু'একটি দেশের (যথা ঃ বাহরাইন, কাতার) মূল লোকসংখ্যার চাইতেও বেশি। অর্থাৎ যদি একত্রে একস্থানে এরা স্বাধীনভাবে বাস করতো, একটি নতুন বাঙালি - আরব কাল্‌চারের সূচনা হতে পারতো। তা হবার নয়। সামাজিক-রাজনৈতিক-ভৌগোলিক কারণে তা কাম্যও নয়। কিন্তু যদি এই বাঙালি প্রবাসীর কিছু অংশ তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য মাঝেমধ্যে জাতীয় দিনগুলো পালনের মাধ্যমে নিজস্ব সংস্কৃতির খানিকটা সেবা করে, তাতে অনেকটা মানসিক তৃপ্তি পাওয়া যায়; মাতৃভূমিকে টেনে আনা যায় আরেকটু অন্তরের কাছে।

আমরা একদিকে বাঙালি, যখন গোটা বাংলার ঐতিহ্য বিভিন্নভাবে পরিস্ফুটিত হয় আমাদের আচার-অনুষ্ঠানাদিতে। অপরদিকে আমরা বাংলাদেশী, যেখানে আমরা অধিকাংশ বাঙালি মুসলমান বা আমাদের মনমানস ইসলামিক ভাবধারায়ও পুষ্ট এবং যখন আমরা নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের মাটিতে লালিত পালিত অধিবাসী। বাঙালি ও বাংলাদেশী এই দুইয়ের সুষ্ঠু সমন্বয় করা এবং এদের সন্ধিক্ষণ ধরে রাখা কঠিন হলেও সম্মান করার মতো। [এই প্রসঙ্গে গ্রন্থটির সপ্তম অধ্যায়ে জাতীয়তা বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে।]

* * * *

আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য বা বাঙালিত্বের সাথে যে কতগুলো দিনক্ষণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে তার মধ্যে পহেলা বৈশাখ এবং আটই ফাল্গুন বা একুশে ফেব্রুয়ারি সমধিক উল্লেখযোগ্য। দুটোই কৃষ্টি ও ভাষার ভারে করেছে

আমাদের জাতীয় জীবনকে ধন্য ও সমৃদ্ধ। শেষেরটি তো বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিকতার সারিতে পৌঁছে দিয়েছে আমাদেরকে। তাই আমাদের উচিত হবে সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতা হতে উর্ধে থেকে আমাদের স্বকীয় জাতীয়তাবোধকে আগলে ধরে সমুন্নত রাখা। স্মরণ রাখতে হবে, জাতীয়তাবোধের পরিচয় যেখানে অস্পষ্ট এবং ক্ষীণ, সেখানে উন্নয়নের স্বকীয়তা এবং স্বাধীনতার ভিত হয় দুর্বল।

* * * *

আমরা অবশ্যই আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে প্রবাসে নাগরিক জীবনের বা আধুনিক জীবনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করবো না বা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে কৃত্রিমভাবে ধরে রাখবো না। আমরা আমাদের সন্তানদের প্রয়োজনে ইংরেজি মাধমে, এমনকি আরবি মাধ্যমেও, লেখাপড়া শেখাবো জ্ঞাণার্জনের জন্য, মা-বাবার কর্মস্থলের কারণে এবং জীবিকার তাগিদে, কিন্তু ঘরে যেন তারা অন্তত সহজ শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে পারে, পত্র-পত্রিকা পড়তে পারে, চিঠি-পত্র লিখতে পারে- সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করলে আধুনিকতায় গড়ে উঠা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সময়েও আমাদের সংস্কৃতির পুরোপুরি বিলুপ্তি ঘটবে না।

আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই আমরা আমাদের নববর্ষ পালন করতে পারি। গভীররাত পর্যন্ত নেচে গেয়ে পান করে অকুস্থলে পড়ে থাকতে চাই না "নিউ-ইয়ার"-এর মাদকতায়; আমরা চাই শালীনতার সাথে, শৈল্পিক আমেজে, সবার সাথে পহেলা বৈশাখ পালন করতে।

* * * *

অধুনা, উন্নত দেশসমূহে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের অন্যতম ধারা হিসাবে বিভিন্ন জাত উদ্ভূত নাগরিকদের যেখানেই কর্মস্থল বা বসবাস, সেখানেই বহুজাতিক সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ বা মাল্টিকালচারালিজম এর যথাযথ স্বীকৃতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে। উল্লেখযোগ্য, ইউনেস্কো কর্তৃক বর্তমান সন থেকে একটি বিশেষ দিনকে, একুশে ফেব্রুয়ারিকে, বিশ্বামাতৃভাষা দিবস রূপে স্বীকৃতিদান করে পরোক্ষভাবে প্রতিটি দেশ ও জাতির আপন আপন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতিও সম্মান দেখানো হয়েছে। পহেলা বৈশাখ এমনই একটি দিন যা বিশ্বের যেসমস্ত স্থানে বাঙালি বসবাস করে সেখানেই কোনো না কোনোভাবে, ঘরোয়া পরিবেশে কিম্বা বৃহত্তর পরিসরে, স্মরণ করা হচ্ছে। যেমনটি হচ্ছে আজ এই মরুপ্রান্তরের উন্মুক্ত স্থানে। এমনিভাবেই আরো বহুকাল ধরে রাখতে হবে আমাদের স্বীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জ্ঞাতার্থে হলেও।

[রিয়াদের উপকণ্ঠে, বাংলা রাইটার্স ফোরামে, ১৪০৪ এর নববর্ষ অনুষ্ঠানে গ্রন্থকারের বক্তব্য থেকে এবং পরবর্তীতে জানুয়ারী ১৯৯৯ইং সংখ্যার একটি প্রবাসী সাময়িকীতে ('প্রভা') প্রকাশিত "বাংলাদেশী সংস্কৃতি-প্রবাসে এর চর্চা" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংক্ষেপিত ও ইষৎ পরিবর্তিত]

['মরুপলাশ', ১৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, বৈশাখ ১৪০৭]

৮

যুগে যুগে পহেলা বৈশাখ ও আমাদের সংস্কৃতি

আমাদের দেশে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন এখন একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে স্বাধীনতাত্তোর কালে এবং গত দেড়দশক ধরে পহেলা বৈশাখ রাজধানী শহর এবং অন্যত্র যেভাবে পালিত হচ্ছে, তা আমাদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে প্রবলভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। গুরুজনদের কাছে ছেলেবেলায় বা এখন থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে যখন শুনতাম, বাংলার মাটিতে কী আনন্দের সাথেই না বৈশাখী মেলা, হালখাতার ব্যবহার, মিষ্টি বিতরণ, আমন্ত্রণাদি, নৌকা বাইচ, বিভিন্ন রকম মেলা, ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। তখন কেবলই ভাবতাম আমরা কখন তা উপভোগ করবো !

ষাটের দশকের মাঝামাঝি একবার বাধা আসে। সামরিক শাসকেরা এই উৎসবের মধ্যে শুধু হিন্দুয়ানির গন্ধ পেতো; কী কাব্য, কী সাহিত্য, কী যে কোনোরকম সংস্কৃতিচর্চা, প্রতিটিতেই তারা দেখতে পেতো ইসলাম রিরোধী আচার অনুষ্ঠান। তাদের একবারও মনে হয়নি, বাংলার মানুষ, বাংলার জীবন একটি হাজার বছরের ঐতিহ্য, একটি জাতিসত্তা, একটি সমৃদ্ধ ইতিহাসের উত্তরাধিকারী। তা ইচ্ছে করলেই কৃত্রিমভাবে মুছে ফেলা যায় না। পাঞ্জাব এবং অন্যান্য পাকিস্তানি এলাকার গুরুত্ব ও কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য, গোঁড়া পশ্চিমারা ধর্মের দোহাই দিয়ে পূর্বাঞ্চলের বাঙালিদেরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে করে রাখতো কোনঠাঁসা। তারা এটুকু জানতো, একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে খর্ব করতে হবে। কিন্তু বেশিদিন তাদের ভ্রান্তনীতি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রভাব খাটাতে পারেনি। ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক বিকাশে বাঙালি আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে।

তারই অন্যতম কার্যক্রম বাংলা নববর্ষ পালন। ফি-বছর পহেলা বৈশাখ আমাদের জাতীয় জীবনে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে, আরো গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে উদ্ভাসিত হতে

থাকে। এই নতুন প্রজন্মের উদ্দেশেই বর্তমান প্রবন্ধে কিছু তথ্য ও অভিমত পেশ করা হলো।

অপরাপর কিছু নববর্ষ, বিশেষ ঘটনা বা ধর্মভিত্তিক দিনকে কেন্দ্র করে সূত্রপাত হয়। যেমন, যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন থেকে শুরু করে ইংরেজি গ্রেগরিয়ান নিউ ইয়ার বা নববর্ষ, হযরত মুহাম্মদের (দঃ) মক্কা থেকে বিদায় হয়ে মদিনা শরীফ চলে যাবার সময় থেকে শুরু হয় হিজরি সন। মুসলমানদের চন্দ্রমাসের সাথে সৌর মাসের সমন্বয় করে প্রবর্তিত হয় বাংলা সন। এরও সূচনা মুসলমানদের দ্বারা। কারো মতে, বাংলা সুলতান হোসেন শাহের সময় থেকে, অর্থাৎ পনের শ' শতক থেকে বাংলা সনের সূচনা। কারো মতে, সর্বভারতীয় পর্যায়ে, সম্রাট আকবরের (১৫৪২-১৬০৫) শাসনামলে চালু হয় বাংলা সন। তবে নববর্ষ পালন শুরু হয় আকবরের আমল থেকেই, তার রাজস্ব সচিব রাজা তোডরমল-এর রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম পদ্ধতি থেকে। কৃষি উৎপাদনে রবিশস্য ও অন্যান্য ফসল সংগ্রহের মূল সময় বসন্তের শেষে, গ্রীষ্মের শুরুতে বা বৈশাখ মাস থেকে। তখন খাজনা প্রদান করা কৃষকদের জন্য সুবিধাজনক। বলা বাহুল্য, কৃষিপ্রধান ছিল সে সময় গোটা ভারতবর্ষ। বাংলা কালপঞ্জি এভাবেই প্রবর্তিত হলো। কৃষি খাদ্যশস্যের সমারোহ থাকায় এবং এসময় গাছে গাছে নতুন কচি পাতার আগমন পরিলক্ষণ করে গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র নতুন বছরকে সাদরে গ্রহণ করা শুরু হয়। ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাঙালির সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয় বাংলা নববর্ষ।

নতুনের সম্ভাবনাই তো জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। পুরানোর দুঃখ, জীর্ণতা, ব্যর্থতা, গ্লানি - সব ধুয়ে মুছে নতুনকে, অজানাকে জয় করার প্রত্যাশায় বাঙালি তৈরি হয় পহেলা বৈশাখ থেকে। দেশজ সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই উৎসব উপলক্ষে গ্রামে গঞ্জে বসে বৈশাখী মেলা, ব্যবসায়ীরা ধরে নতুন হালখাতা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী করে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান, পত্রপত্রিকা বেতার টিভি প্রভৃতি গণমাধ্যম এবং শিক্ষাঙ্গন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করে। সর্বত্র এক উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করে। ঢাকা শহরে ইদানীংকালে নববর্ষ বিশেষ তাৎপর্যের সাথে জাতীয় অনুষ্ঠানমালার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। রাজধানীর বাইরেও বিভিন্নভাবে এই নববর্ষ পালিত হয়। যেমন চট্টগ্রাম জেলায় আমানি খাওয়া, বলী খেলা, ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা জেলায় গরুরদৌড়, নৌকা বাইচ, লাঠিখেলা, রাজশাহী এবং নিকটবর্তী উত্তরাঞ্চলে গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠান - যা চলে পুরো বৈশাখ মাসে - এগুলো কমবেশি এখনো প্রচলিত। সাংস্কৃতিক জীবন মানেই সুন্দর ও শোভন জীবন - এই সত্যে বিশ্বাস করে বাংলার মানুষ তাদের সাংস্কৃতিক পরিচর্যার অন্যতম দিন হিসাবে পহেলা বৈশাখকে তাদের কালপঞ্জিতে বরাবর অন্তর্ভুক্ত করে রাখবে। এমনকি প্রবাসেও যেখানে যেখানে বাঙালি বসবাস করে, পহেলা বৈশাখ পালনের দৃষ্টান্ত উত্তরোত্তর সেখানেও বাড়ছে বৈ কমছে না।

এই বিশেষ দিনটিতে বড় শহরে বাস করেও নগরবাসীরা ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ জীবন প্রত্যক্ষ করে। পিঠা খাওয়া থেকে শুরু করে পান্তাভাতের আস্বাদন, বিভিন্ন হাতের কাজের সাথে পরিচয়, ইত্যাদি সব মিলে যেন এক নুতন - অথচ অতি পুরানো - জগতের কাছাকাছি পৌঁছে তৃপ্তিলাভের সুযোগ হয়। আপন কৃষ্টি, ঐতিহ্য এবং পূর্বপুরুষদের জীবনধারণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে মুহূর্তের জন্য হলেও গর্ববোধ করি। আমরা তো উড়ে আসিনি। আমাদেরও ইতিহাস, সংস্কৃতি রয়েছে, আমরা ঐতিহ্যধনী বাঙালি। আমরা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতিভিত্তিক রাষ্ট্র লাভ করেছি। এখানে সবকিছুর মধ্যে শুধু একটি ধর্ম বা ইসলামিক আচার অনুষ্ঠান খুঁজলে চলবে না, আমাদের বাঙালি হিসাবে যে জাতীয় সত্তা তারও মিশ্রণ থাকতে হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশের লোক মূলত বাঙালি মুসলমান। ধর্মকে আমরা শ্রদ্ধা করবো, ব্যক্তিজীবনে বাস্তবে যতটা সম্ভব আমরা পালন করবো, নিজেদের জীবনধারাকে এর আওতায় প্রবাহিত করবো। কিন্তু আমরা যে বাঙালি, আমাদের সংস্কৃতিতে যে বাংলা মাটির গন্ধ, এই অঞ্চলের অতিসমৃদ্ধ শিল্প-সাহিত্য যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তাও স্মরণ রাখবো। আমরা পাশ্চাত্যধারায় সম্পূর্ণ অনৈস্লামিক স্টাইলে ‘নিউইয়ার’ করবো না, আমরা বাঙালির ঐতিহ্যে লালিত অসাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করে নববর্ষ পালন করবো, প্রতি পহেলা বৈশাখে কবির সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আহ্বান করবো-

..... এসো হে বৈশাখ এসো ... ।
হে বৈশাখ
তুমি নব নব সাজে
এসো আমাদেরই মাঝে।

[‘মরুপলাশ‘ বর্ষবরণ সংখ্যা বৈশাখ ১৪০৯]

৯

বিশ্বমাতৃভাষা দিবস, বাংলা ও বাংলাদেশ

- এক -

মনের ভাব প্রকাশ করতে অথবা অন্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে অথবা কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন লেনদেন সফল করতে একটি উন্নত ও সাবলীল আধুনিক ভাষার প্রয়োজন অত্যধিক। আমাদের এবং বিশ্বের সর্বমোট বাইশ কোটি মানুষের মাতৃভাষা বাংলা এমনি একটি ভাষা। স্বচ্ছ এবং বোধগম্য ভাষায় যে কোন কিছু ব্যক্ত করতে এই ভাষার জুড়ি কম। সুষ্ঠুভাবে শিখে এবং নিয়মিত চর্চা করে ভাষাটিকে প্রয়োগকারীর পূর্ণ আয়ত্তে এনে আজ বাংলা ভাষায় যে কোন প্রকাশনায় উৎকর্ষতা আনা সম্ভব। এই ভাষা একদিকে যেমন অতি সাধারণ মানুষের ব্যবহারে অনায়াসে লাগতে পারে, তেমনি উচ্চশিক্ষিত বা কারিগরী পর্যায়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের জন্যও হতে পারে যথার্থ প্রকাশনা মাধ্যম।

আমাদের মাতৃভাষা আজ বিশ্ব দরবারে সাদরে স্বীকৃত। কী জাতিসংঘে, কী বিশেষ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আজ তাৎক্ষণিক অনুবাদের মাধ্যেমে বাংলা ভাষা অন্যতম অফিসিয়াল ভাষা হিসাবে বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। জাতিসংঘে ১৯৭২ সনে এবং ১৯৯৯ সনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অফিসিয়াল বক্তব্যদানে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। ইতোমধ্যে, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯-এ একটি অভূতপূর্ব সম্মান প্রদর্শন করা হলো বাংলাভাষাকে - প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারিকে বিশ্বমাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালন করার জন্য জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো ঘোষণা দিয়েছে। ১৫২টি দেশ এই দিনে বিশ্বব্যাপী নিজ নিজ ভাষা দিবস পালন করবে, পহেলা মে-কে যেমন বিশ্ব শ্রমিক দিবস রূপে বিবেচনা করা হয়। ১৯৫২ - তে বাংলার মাটিতে বরকত, সালাম, জব্বার, শফিক প্রমুখ শহীদানের আত্মাহুতির বিনিময়ে অর্জিত এবং ১৯৫৬ সনের প্রথম শাসনতন্ত্রে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতির পর বাংলাভাষার এক অভাবনীয় যাত্রা শুরু হয়। তখন পর্যন্ত সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পশ্চিমবঙ্গে এই ভাষার পরিচর্যা অধিকতর প্রভাবশালী অনুভূত হয়ে আসছিলো। কিন্তু সত্যিকারভাবে বিশ্বচেতনা জাগ্রত হয়েছে, বাংলাদেশে বাংলাভাষার ব্যবহার, প্রচার ও প্রসার-এর মাধ্যমে। এমন জাতি আর কোথায় আছে, যেখানে ভাষার অধিকারকে কেন্দ্র করে পর্যায়ক্রমে স্বাধিকার আন্দোলন গড়ে উঠে এবং সর্বশেষে স্বাধীনতা লাভ হয়। তেরো কোটি বাঙালির রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস তো অনেকাংশে

তাই। পঞ্চাশ বছর পরও বাংলার সন্তানদের অতুলনীয় ত্যাগ বিশ্ববাসী বিস্মৃত হয়নি - তারা জাতি থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দান করে তার প্রমাণ দিয়েছে।

- দুই -

বাংলা ভাষার মাধুর্য, সমৃদ্ধতা, স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিয়ে ভাষাবিদেরা আরো গবেষণা করবেন। তাদের বাইরেও শিক্ষিত সমাজ বিশ্বমাঝে প্রচারের জন্য কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেন। অন্যতম কার্যক্রম হিসাবে রয়েছে এবং সরকারি বিবেচনায়ও আছে - ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক ভাষা কেন্দ্র বা ইনষ্টিটিউট স্থাপন। সেখানে বাংলাভাষার সাথে সাথে বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষা নিয়ে গবেষণা ও চর্চা হবে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রধান প্রধান আন্তুর্জাতিক ভাষাগুলোতে বাংলাভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপরাপর বিষয়াদি, বিভিন্ন চিন্তা-চেতনার ফসল এবং সর্বোপরি বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণাগ্রন্থ অনুদিত হয়ে ব্যাপক আকারে বাংলাভাষা এবং প্রয়োগকারীদের পরিচিতি লাভ হবে। আজ ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি ভাষা যেভাবে বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দেশের সংস্কৃতি ও তথ্য বিভাগগুলোর বদৌলতে, সেভাবে বাংলা ভাষাকেও একদিন বিভিন্ন দেশে পরিচয় করা যাবে না কেন? শুনে আনন্দবোধ করছি, অধুনা এবং অতিসম্প্রতি লালন ফকির, হাসন রাজা - এদের কিছু কিছু মূলগ্রন্থের অনুবাদ ইউরোপীয়ান ও আমেরিকানেরা শুরু করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বকবির প্রচার তো ভাষান্তরে সেই ১৯১৩ সন থেকেই রয়েছে। অনেক আধুনিক সাহিত্যিকের নির্বাচিত লেখার অনুবাদও প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন ভাষায়। সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গের নবনিযুক্ত উপ-মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশে কিভাবে অফিসিয়াল ভাষা হিসাবে বাংলাভাষার ব্যবহার সম্ভব হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতা রফত করার জন্য তিনি নিজে এবং উচ্চ পর্যায়ের কিছু কর্মকর্তা বাংলাদেশে আসবেন। কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে উদ্ভূত অন্য একটি সফল অভিজ্ঞতা (দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে মাইক্রোক্রেডিট ব্যাংকিং ব্যবস্থা) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত হয়ে আসছে, আর আজ আমাদের গর্বের মাতৃভাষার অভিজ্ঞতার সফলে অন্যান্য দেশও উপকৃত হবে - আমাদের কাছ থেকে শিখবে - তা যে কোন বাংলাদেশীর জন্য চমৎকার সংবাদ। সেই বাংলা মায়েরই আঁচল ধরে মাতৃভাষাকে সম্মান করে এবং এর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছটা কি ছড়িয়ে দিতে পারবোনা আমরা সারা বিশ্বে, নতুন শতকে?

- তিন -

একথা অনস্বিকার্য, বারবার যা প্রমাণিত হয়েছে, ইংরেজি ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেও মাইকেল মধুসূদন থেকে শুরু করে আজকের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি মাতৃভাষার চর্চায় নিয়োজিত থেকে ভিন্‌দেশী ভাষার চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তিবোধ করেছেন বেশী। তারা তাদের লেখনী প্রতিভা দিয়ে বাংলাভাষাকে করেছেন সমৃদ্ধতর ও অধিক শক্তিশালী। মাতৃভাষা যেন মায়ের আঁচল; এর ছায়ায় যেমন তৃপ্তি, তেমনি নিরাপত্তা। হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে গিয়েও বা সামনে ঝুঁকে গিয়েও গাড়ির সীট বেল্টের টানের মতো, মায়ের কোলে

নিরাপদে অবস্থান করা যায়, মাতৃভাষার উপর ভর করে। একেবারে ভয়ানক অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় না। বরঞ্চ মাতৃভাষা থেকে দূরে সরে যেতে গিয়েই অনেকে হোঁচট খেয়েছেন, পড়ে গিয়েছেন। তাই তো ইউনেস্কো প্রতি দেশের মাতৃভাষাকে ধরে রাখতে চাইছে, স্ব স্ব স্থানে সেই ভাষার অবস্থান পাকাপোক্ত করে। অবশ্যই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অকৃত্রিম সেবার এক উজ্জ্বল অনুশীলন, মাতৃভাষার চর্চা এবং এর যথোপযুক্ত প্রচলন।

কিছু কিছু পেশাগত কাজকর্ম ছাড়া বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগ বা ব্যবসা-বাণিজ্যের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহার ছাড়া সর্বত্র, এমনকি বিচারবিভাগ, চিকিৎসা বা প্রকৌশল ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষার প্রচলন সম্ভব হচ্ছে। প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার। আমরা কোন কোন বড় বড় ডাক্তারকেও বাংলায় প্রেসক্রিপশন লিখতে দেখেছি। তাতে অধিকাংশ রোগী, এমনকি অনেক ফার্মাসিষ্ট বা কম্পাউন্ডার বা নার্সও বুঝতে পারেন ভালো। বিজ্ঞান বা কারিগরী শিক্ষাও যে, কোন উন্নত মাতৃভাষায় বা বাংলা ভাষায় সম্ভব এবং এটা যে একান্ত কাম্য - সর্ব মহলে সাফল্যের জন্য - তা সত্তর দশকের গোঁড়াতে অনুভব করেছেন এবং সমর্থন জুগিয়েছেন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ডঃ কুদরাত-ই খুদা প্রমুখ।

আমরা আমাদের বাংলাভাষার স্বার্থ রক্ষার্থে অবশ্য ইংরেজি বা অনুরূপ মানের আন্তর্জাতিক ভাষাকে (যথা ঃ ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান, চীনা, আরবি ইত্যাদি) হেয় করছি না। এগুলোও অনেকের মাতৃভাষা। আমরা সম্মান করবো, যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করবো আমাদের মাতৃভাষাকে। স্বল্পসংখ্যক বিশেষজ্ঞের স্বার্থে - জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, বৈদেশিক বিভাগে বা বিদেশে কর্মরত চাকুরে, কিম্বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লিপ্ত ব্যবসায়ী প্রমুখ - দেশের আপামর শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে ইংরেজি তথা বিদেশী ভাষা বাধ্যতামূলক ভাবে এবং ভালোভাবে শিখাতে গিয়ে আমরা কি একদিকে কষ্টার্জিত স্বাধীন দেশের সম্পদ নষ্ট করবো (প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ, উপকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে) এবং অপরদিকে শিক্ষিত ব্যক্তির মেধা এবং মৌলিকত্বকে খর্ব করবো ? [এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা প্রবন্ধকার অন্যত্র করেছেন।]

*   *   *   *

নির্দিষ্ট কিছু কিছু পেশার সীমিত সংখ্যক লোক ইংরেজি বা অন্য কোন আন্তর্জাতিক ভাষা ভালোভাবে শিখলেই চলবে। যথাঃ আরব দেশগুলোতে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য (পেশাজীবী, কুটনীতিক, ব্যবসায়ী, ইত্যাদি) ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের চেয়ে আরবির দক্ষতা অধিকতর ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে।

প্রথমে তো আমরা স্বনির্ভর হবো, নিজের ভাষা, নিজের সম্পদের সুব্যবহার করে; তারপর আন্তর্জাতিকতা লাভ করবো। আপন সম্পদের সমৃদ্ধতা থাকলে এক সময় না একসময় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আসবেই - অন্যেরাই আসবে আমাদের সম্পদের সংবাদ নিতে, ব্যবহার করতে এবং এ- থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে। আমাদের মধ্যে এতটুকু দেশপ্রেম

এবং নিজস্ব শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্যে মমত্ব থাকতেই হবে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক হয়ে, তদুপরি সকল লোকের একক ভাষা ও একটি অতি সমৃদ্ধ ভাষার অধিকারী হয়েও ভালোভাবে ইংরেজি শেখার জন্য সকল শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মেধা, শ্রম, অর্থব্যয় অপচয়ের পর্যায়ে গণ্য হবে। কোথায় আমাদের ইংরেজি ভাষা শেখাবার আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, কোথায় সেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষিত ইংরেজি শিক্ষক? তাহলে এই অনাকাঙ্ক্ষিত চাপ সবার জন্য কেন? এটা বুঝেছিলো বলেই আজকের উন্নত দেশ জাপান, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া প্রভৃতি এলাকায় তাদের সমস্ত কর্মকান্ড মাতৃভাষাতে পরিচালনা করে আসছে। নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে, অবশেষে গত কিছুকাল ধরে তারা, আন্তর্জাতিক বাজারে আরো বিস্তার লাভের চেষ্টায় তাদের কিছু কিছু লোককে (শুধুই বিশেষ কিছু লোককে, সবাইকে নয়) ইংরেজি শেখাবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে। আমাদের সাধারণ্যে প্রচারিত ভ্রান্তধারণা তথা নিজেদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মানসিকতা (ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্স) পাল্টাতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে অধিকাংশ কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব, এটা বিভিন্ন পদক্ষেপে প্রমাণ করতে হবে। পাশাপাশি শুধু সংশ্লিষ্ট সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিবর্গকে ভালো করে (অশুদ্ধভাবে নয়) ইংরেজি ভাষার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

* * * *

- চার -

প্রবন্ধ সমাপ্তির পূর্বক্ষণে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে বারো লক্ষাধিক বাংলাভাষীর উদ্দেশে, প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিবেচনা করার জন্য কিছু প্রস্তাব রাখছি -

১। মাতৃভাষাকে শুধু মুখেমুখে ভালোবাসলেই চলবে না। এর যথাযোগ্য ব্যবহার এবং পরিচর্যা প্রয়োজন। মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি বাঙালি অধ্যুষিত দেশে একটি করে "প্রবাসী ভাষাসৈনিক" গ্রুপ বা সংঘ তৈরী হোক - যার সদস্যদের মূল কাজ হবে নিম্নরূপঃ- যে যেখানে কর্মরত বা যার যেখানে বাসস্থান, তার আশেপাশে বাংলা সাইনবোর্ড এবং পাবলিক বিজ্ঞপ্তি লক্ষ্য করুন - এগুলোর ত্রুটিপূর্ণ গুলোর শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া শুরু করুন। এই কাজটি শিক্ষিত যে কেউ চুপচাপ করে যেতে পারেন - ছাত্র, শিক্ষক, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, গৃহবধু - সবাই। যে কোন সাহিত্য সংঘ বা ব্যবসা-গ্রুপ এর কার্যালয় বা বাংলাদেশ স্কুলের বাংলা বিভাগ বা দূতাবাসের শিক্ষা-সংস্কৃতি-তথ্য বিভাগকে অবহিত করুন। অন্ততঃ প্রতি তিন মাসে একবার সেগুলো একাধিক পত্র-পত্রিকায় (প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রকাশিত) প্রচার করুন। শুদ্ধিকরণের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের অথবা উপরোক্ত কোন সংস্থার সহায়তা কামনা করুন। [বর্তমান প্রবন্ধকারের একটি নির্দিষ্ট মাসের পাঁচটি বিভিন্ন দিনে জরিপকৃত প্রায় আশিটি সাইনবোর্ডের মধ্যে তিরিশটির বেশিতে কোন না কোন ভুল পাওয়া গিয়েছে (যথা বানান, শব্দভাগ বা একত্রীকরণ, ভাষাগত, ইত্যাদি)]।

২। প্রবাসী বাঙালিদের জন্য একটি বড় কাজ হবে - সৌদিতে কর্মরত যে প্রায় আট লক্ষ বাংলাদেশী (যাদের অনেকেই পড়তে লিখতে পারেন) তাদের জন্য একটি সংবাদ

সাময়িকীর ব্যবস্থা করা। নিজেরা স্বাধীনভাবে সম্ভব না হলেও কোন জনপ্রিয় ইংরেজি দৈনিকের দুচার পৃষ্ঠা স্থান সপ্তাহান্তে বাংলার জন্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। তাতে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আর্থিক সমর্থন দরকার হবে, তাদের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে, 'দি এ্যারাব নিউজ' পত্রিকায় উর্দু ভাষায় যেমন হয়ে আসছিলো কিছুকাল। কমপক্ষে যে ২০% প্রবাসী, সংবাদপত্র পাঠ করার এবং গ্রাহক হবার যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখেন - সেই একলাখ ষাটহাজার শিক্ষিত লোকের এক পঞ্চমাংশ (অর্থাৎ তিরিশ হাজার লোক) যদি নিয়মিত সংবাদপত্রটি ক্রয় করেন, তাহলে যে কোন বিদেশী সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ বাংলা শাখা প্রকাশে আগ্রহী হবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

৩। প্রবাসী বেতার, টিভিতেও বিশেষ বাংলা অনুষ্ঠানের চেষ্টা হতে পারে। এতে প্রবাসীদের সাথে বাংলাদেশের সরকারি আনুকূল্য ও সহায়তা প্রয়োজন হবে। দূতাবাসের তথ্য ও সংস্কৃতি শাখার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম রূপে চিহ্নিত করতে হবে এই কর্মসূচিকে।

৪। আরেকটি কাজ হতে পারে - শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরেও যুবসমাজের মধ্যে লেখালেখির প্রতিযোগিতা করে, জনসমক্ষে শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলার চেষ্টা করে এবং অন্যান্য অঞ্চলের বাংলাদেশীদের উপস্থিতিতে কোন বিশেষ বিশেষ স্থানের আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার পরিহার করে, যাতে একটি শুদ্ধ চলতি ভাষার ব্যবহার বাড়ে।

৫। দেশে ছুটি কাটিয়ে প্রবাসে ফেরার সময় কিছু বাংলা প্রকাশনা কিনে এনে নিজে পড়ে অন্যকে (বিশেষ করে যারা নিয়মিত বা ফি-বছর দেশে যাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত) পড়ার সুযোগ করে দেয়া যেতে পারে। বিভিন্ন সময়ে এরকম বহু লোকের সংগহ করা প্রকাশনা সমূহের একটি প্রদর্শণী, নতুন নতুন পুস্তক, পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা উৎসব বা আলোচনা অনুষ্ঠান - এর আয়োজন করে দর্শকমণ্ডলী এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর মাঝে বাংলা ভাষার প্রতি অধিকতর অনুরাগ সৃষ্টি করা যায়। পুস্তক প্রদর্শনীটি বাংলাদেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং মাতৃভাষা দিবসকে সম্মান করে ফেব্রুয়ারির উপযুক্ত সময়ে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

৬। একটি স্থায়ী ছোটখাটো পাঠাগারের ব্যবস্থা করা যায় - যাতে রিয়াদ শহরের ও আশেপাশের বা জেদ্দা বা দাম্মাম শহরের ও এগুলোর আশেপাশে যথাক্রমে আনুমানিক তিনলাখ, আড়াইলাখ এবং দেড়লাখ (বাংলাদেশীদের অবিশষ্ট একলাখ সৌদির অন্যত্র বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন ধরে নিয়ে) বাংলাভাষী মাঝেমধ্যে কিছুকিছু বইপুস্তক, পত্র-পত্রিকা দেখতে ও পড়তে পারেন। একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বা তথ্যকেন্দ্রও স্থাপিত হতে পারে। দূতাবাসে বা তার কাছাকাছি কোথাও অথবা বাংলাদেশ স্কুলে বা তার নিকটস্থ কোথাও অথবা বাংলাদেশীদের অধিক সমাগম যেখানে তার নিকটবর্তী কোন স্থানে এই ধরনের কেন্দ্র বা পাঠাগার চালু করার বিষয় সবাই মিলে সক্রিয়ভাবে চিন্তা করতে পারেন।

উপরোক্ত পদক্ষেপ ছাড়াও প্রবাসে বাংলাভাষা প্রচার ও সেবার আরো সুপারিশ অবশ্যই পাঠকদের থাকবে। আমরা সেসব জানতে পারলে তা সাদরে বিবেচিত হবে। পরবর্তীতে সকলের পরামর্শের সমন্বয়ে জাতীয়ভিত্তিক পদক্ষেপ নেবার অনুমোদন প্রস্তুত হতে পারে।

['মরুপলাশ', বিশ্বমাতৃভাষা দিবস সংখ্যা, ১৩শ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০০-ঈষৎ পরিবর্তিত।]

১০

একুশের চেতনা ঃ মাতৃভাষার যথার্থ সেবায় প্রবাসী

যে কোন দেশের ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষতায় থাকে সেখানকার সভ্যতার নিদর্শন। ভাষার সযত্ন প্রয়োগ সাহিত্য ও জীবনকে করে সুন্দর ও সহজ। সেই ভাষাভাষী - জাতিকে করে সম্মানীয়। ভাষার বোধগম্যতা ও সঠিক ব্যবহার আমাদের যোগাযোগ এবং ভাবের আদানপ্রদানের পদ্ধতিকে করে তোলে অর্থবহ। এই ভাষা যখন বাংলার মতো মাতৃভাষা হয়, তখন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় কতগুলো বিষয়ের দিকে।

বাংলা ভাষার মাধ্যমে কেউ কেউ বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন। এই ভাষার সাহিত্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আসনে স্থান করে নিয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে বাংলাদেশে বাংলা ভাষা অভূতপূর্ব গুরুত্ব পেয়েছে। অতি সীমিত দুই একটি ক্ষেত্র ছাড়া সর্বত্র এর প্রচলন এই ভাষাকে নতুন মর্যাদা দান করেছে। অবশ্য এতে কিছু কিছু সমস্যারও যে সৃষ্টি হয়নি তা বলা যাবেনা।

সদ্য স্বাধীন দেশে সর্বত্র একটি ভাষাই ব্যবহৃত হতে চলেছে - কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রস্তুতি ছাড়া। অন্যভাষায় শিক্ষিত অনেক বাঙালি এই ভাষাটিকে আয়ত্ত করার সুযোগ পায়নি। মাতৃভাষা বলেই যে এর সুষ্ঠু, শুদ্ধ ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে, তা নয়। অফিস-আদালত এবং বিভিন্ন কর্মস্থলের নথিপত্রে, লেখালেখিতে, যোগাযোগে কর্মচারি-কর্মকর্তাদের দ্বারা বাংলাভাষার যথেচ্ছ ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করেছি। ভালো ইংরেজি লিখতে ও বলতে পারলে যেমন চাকুরিতে পদোন্নতির অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হিসাবে দেখা হয়, ভালো বাংলা লিখতে ও বলতে পারলেও অনুরূপ বিবেচনা কাম্য। অফিসিয়াল বা কর্মস্থলের পরিমন্ডলে এইভাবেও হবে মাতৃভাষার প্রতি সুবিচার।

রাতারাতি কেউ অভিধান বা পরিভাষা দেখে, এতদিনের ব্যবহার করা ইংরেজি বা উর্দু শব্দগুলোকে বাংলায় ভালো সহজবোধ্য প্রতিশব্দ থাকা সত্ত্বেও শুধু বাংলা হরফে লিখে মুক্তি পেতে চেয়েছেন। আর বানান ও ব্যাকরণের রীতিনীতির প্রতি তো অনেকের অজ্ঞতা বা অবহেলা রয়েছেই ।যার যেভাবে খুশী সেভাবেই করেছেন এর ব্যবহার বা অপব্যবহার। এমনকি রাষ্ট্রের নামকরণেরও ঐক্য স্থাপিত হয়নি - "বাংলাদেশ"কে কেউ কেউ দুই শব্দে "বাংলা দেশ" হিসাবে অথবা সরকারি নামকরণ "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার"কে কেউ কেউ "প্রজাতন্ত্রী", কেউ বা "গণ প্রজাতন্ত্রী"র মতো দুই শব্দে ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। নিজের কর্মরত মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা প্রতিষ্ঠনাকে একেকজন একেক বানানে অলংকৃত করেছেন। রাস্তাঘাট, দোকানপাট, অফিস-আদালতের সাইনবোর্ড বা নামফলক খেয়াল করলে বানানের রকমারি দেখে লজ্জাবোধ হয়। ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা লিখলেই যেন সব শেষ। কোন ষ্টান্ডার্ড বা মান অনুসরণ করাতে অনীহা।

ব্যক্তিগতভাবে আমি রিয়াদ প্রবাসে বাংলাদেশী দোকানগুলোতে বাংলা সাইনবোর্ড টানানো দেখে পুলকিত হয়েছি। এই শহর থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন বাংলা পত্র-পত্রিকা দেখলেও আনন্দ অনুভব করি। পাশাপাশি, ভাষাটির ব্যবহারে অযত্ন সহজে লক্ষ্যণীয়। উদাহরণস্বরুপ, এখানে সচরাচর সাইনবোর্ড বা ব্যানার বা পত্রপত্রিকায় যেসব বানান বা ব্যকরণগত ভুল থাকে, তার মধ্যে বহুবার দেখা যায় এগুলো ঃ

'সচীব' ('সচিব' এর স্থলে) ; সূর্য্য ('সূর্য) ; 'উপকারীতা' ('উপকারিতা') ; 'সহযোগীতা' ('সহযোগিতা') ; 'ভূল' ('ভুল') ; 'সুষ্ঠ' ('সুষ্ঠু') ; 'দারিদ্র্যতা' ('দারিদ্র্য' বা 'দরিদ্রতা') ইত্যাদি। আরেকটি দৃষ্টিকটু বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন লেখালেখিতে সাধু-চলতি ভাষার মিশ্রণ।

বাংলাভাষা তথা আমাদের মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা শিক্ষাজীবন থেকে কর্মজীবন পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশুনার সময় -- যখন বাংলা একটি বাধ্যতামূলক বিষয় থাকে -- শ্রেণীকক্ষে এবং বাড়ীতে শেখার সময় একটি ছাত্রের সপ্তাহে যে সময় ব্যয় হয়, এবং সেখান থেকে ইংরেজি বা অন্যান্য বিষয়ের জন্য যেই সময় নিয়োজিত হয়, বাংলা ভাষার জন্য কি সেই অনুপাতে সময় দেয়া হয়? মাতৃভাষা বলে সময় অনেকটা কম লাগতে পারে, কিন্তু ততটা নয় যতটা অধিকাংশ শিক্ষার্থী এর জন্য সাধারণত নির্ধারণ করে থাকে। বাংলা ভাষায় রচিত ভালো ভালো সাহিত্যিকদের রচিত উন্নতমানের গ্রন্থগুলো পাঠ করা বা মানসম্পন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখালেখি পাঠ করা বা নিজেরা লিখে অভ্যাস রাখা এবং সেগুলো শিক্ষক বা যারা ভালো বাংলা জানেন তাদেরকে দেখিয়ে শুধরিয়ে নেবার সুযোগ অনেকের হয়তো নেই। শুধু কবি সাহিত্যিক সাংবাদিকরাই বাংলাভাষার চর্চা করবেন, তা ভাবা কি ঠিক? এর ব্যবহার যেহেতু আমাদের সর্বক্ষেত্রে অন্ততঃ গত তিন দশক ধরে, তাই একে সযত্নে অধ্যয়ন করা এবং এর যথার্থ প্রয়োগ করা আমাদের দায়িত্ব।

অনেকটা নতুন করে আমরা শপথ নেই প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের শহীদ বরকত, সালাম, জব্বার, শফিক - এদের বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং অনেক নাম-না-জানা ভাষা সৈনিকের ত্যাগকে স্মরণ করে তবু আমরা বছরের একটি সময়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভাষার প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এর গুরুত্ব নেহায়েত কম নয় - প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে।

কেউ কেউ মনে করেন, যারা ইংরেজি ভাষা শিখেন বা এর চর্চা করেন বা এর নিয়মিত ব্যবহার করেন তাদের পক্ষে বাংলাভাষার চর্চা কঠিন। কথাটি কতটুকু ঠিক? আসলে শিক্ষাজীবনের গোড়াতে একটু শক্ত ও সঠিকভাবে বাংলাভাষাটি শেখা হলে এবং পরবর্তীতে এর চর্চা করলে যেই ভাষায়ই লেখাপড়া বা কাজকর্ম হোকনা কেন, বিশেষ অসুবিধা হয় না। বরঞ্চ বহু দৃষ্টান্ত আছে - যারা বিদেশী বা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পড়াশুনা করেছেন তাদের অনেকে পরবর্তী জীবনে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন। পশ্চিমবংগে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাস, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, হুমায়ুন কবীর, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, প্রমুখ এবং বাংলাদেশে ইব্রাহীম খাঁ, সৈয়দ আলী আশরাফ, সৈয়দ আলী আহ্সান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ, শামসুর রাহ্মান, সৈয়দ শামসুল হক, মনজুরে মওলা এবং আরো সাম্প্রতিক কালে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম - এরা সার্থকতার সাথে বাংলাভাষায় অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এবং এদের জীবিতরা এখনো করছেন। ষাটের দশকের মধ্যভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে আমার শিক্ষক সৈয়দ সাজ্জাদ হুসাইন, খান সারোয়ার মোর্শেদ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, রাজিয়া আমিন প্রমুখের বিভিন্ন সময়ে রচিত বাংলা প্রকাশনা পড়লে মনেই হতো না যে এরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আনুষ্ঠানিক উচ্চতরশিক্ষালাভ করেননি, অথচ এরা সবাই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের যার যার সময়ের অত্যন্ত কৃতি ছাত্র এবং পরবর্তী সময়ে ইংরেজির সুপন্ডিত। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে তারা পাশ্চাত্যের প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক সাহিত্যের সাথে সহজে পরিচিত হয়ে নিজের মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করতে অবদান রেখেছেন।

মোট কথা, আমরা যেই বিষয়ে বা মাধ্যমেই কর্মজীবনে থাকিনা কেন, সতর্কতা, চেষ্টা ও নিয়মিত চর্চা থাকলে নিজেদের মাতৃভাষা বাংলায় যথাযথ অবদান রাখা সম্ভব করে তুলতে পারি। সবাই কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক হবেন তা নয়; ব্যবহারিক জীবনে নিজস্ব গন্ডিতে যদি আস্থা ও গর্বের সাথে আমরা শুদ্ধ, সহজ এবং সাবলীল বাংলা ভাষা চর্চার ইচ্ছা পোষণ করি, তাহলে অধিকাংশ ব্যবহারকারী পারবো বাংলাভাষাকে আরো উৎকর্ষতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

টেকনিক্যাল এবং অফিসিয়াল লেখালেখির বেলাতেও শুদ্ধ বানানে, শুদ্ধ বাক্যে প্রকাশিতব্য বিষয় পেশ করা আবশ্যক। যা কিছু প্রকাশিত হবে বা লিখিত হবে, যা কিছু অন্যের দ্বারা পঠিত হবে, তাতে বিশেষ খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশের বেলায় এটা আরো অধিক প্রযোজ্য। কারণ পৃথিবীর বাইশ থেকে পঁচিশ কোটি বাংলাভাষাভাষীর অধিকাংশেরই বসবাস বাংলাদেশে এবং একমাত্র বাংলাদেশেই এটি রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় ভাষা। পশ্চিমবংগে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে এটি রাষ্ট্রভাষা (শুধু ঐ প্রদেশ বা রাজ্যেরই, কোন গোটা দেশের নয়)। আসাম, উড়িষ্যা, বিহার, মনিপুর. আরাকান-এ এটি মাতৃভাষা (রাষ্ট্র বা রাজ্য ভাষাও নয়)। বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, জাপান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, প্রভৃতি অঞ্চলে বাংলাভাষাভাষী প্রচুর লোক বর্তমানে বাস করছেন। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাভাষা সেসব স্থানে কমিউনিটিতে হলেও ব্যবহৃত হচেছ। তাদের সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় এই ভাষার প্রচলন যথেষ্ট। এদিক থেকে সাম্প্রতিককালে এই ভাষা আন্তর্জাতিকতা অর্জন করে চলেছে বটে। বি.বি.সি. এবং ভয়েস অব আমেরকির মতো জনপ্রিয় বেতারের মাধ্যমে এবং অতি সম্প্রতি ইন্টারনেটের মাধ্যমে আজ বিশ্বের যেখানে যেখানে বাংলাভাষী মানুষ রয়েছে সেখানে এই ভাষা উচ্চারিত, পঠিত ও প্রচারিত হচ্ছে।

আধুনিক বিশ্বের বিস্ময়কর সৃষ্টি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং ইন্টারনেটে যেদিন বাংলাভাষার আরো প্রচলন হবে সেদিন হবে এর ব্যাপকতর প্রসার। প্রসঙ্গত ই-মেইলে আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে গত কয়েকবছর রোমান হরফে বা ইংরেজি বর্ণে বাংলা লিখে (যথাঃ Amra bhalo achi, chinta korona ইত্যাদি) সৌদি-কানাডা যোগাযোগ বজায় রেখেছি [আমাদের দুই সন্তানই কানাডায় বসবাস করছে]। উপরন্তু ইংরেজি ভাষাভাষীর কাছ থেকে প্রয়োজনে গোপনীয়তা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছি। এই পদ্ধতিতে অবশ্য বাংলা বানানের চর্চা না হলেও শুদ্ধভাবে সহজ বাংলা অভ্যাস করার সুযোগ রয়েছে - যেখানে দিনের পর দিন কানাডায় আমাদের সন্তানদের সাথে বাংলা ভাষায় লিখিত ব্যবহার সম্ভব ছিলো না, মাঝে মধ্যে টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ থাকলেও। মাতৃভাষার যে তৃপ্তি, যে আস্বাদন তা অন্য কোন ভাষায় সম্ভব নয়, তাতে স্বাচ্ছন্দ্য বা fluency যতই থাকুক। চিঠিপত্রে লেগে যায় মাসাধিক। ইন্টারনেটে বা ই-মেইলে যোগাযোগের বাস্তবায়ন হয়েছে মুহূর্তমধ্যে, ইদানিং বাংলাভাষায়ও।

একুশের দিনে যেন আমাদের চৈতন্য জাগে, যেন পুনর্বার শপথ হয় - যে যেভাবে পারি, বিদেশ-বিভূঁইয়ে হলেও, যেন পারি নিজ নিজ কাজকর্মে নিয়োজিত থেকে (ইংরেজি বা অন্য ব্যবহারিক ভাষার প্রয়োগ ঠিক রেখেও) অন্ততঃ কিছুটা সেবা করতে - এর পঠন-পাঠে, এর মাধ্যমে শুদ্ধভাবে লেখালেখিতে, পরিচিত মহলে এর প্রসার ঘটাতে। কাজটি দুরুহ হবেনা যদি আমরা স্মরণ রাখি যে হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত আমাদের এই মাতৃভাষা। কী ধ্বনিবিন্যাস, কী লিখনরীতি, কী প্রকাশক্ষমতা - প্রতিক্ষেত্রেই এর বৈশিষ্ট্য বিরাজমান। আধুনিক বাংলা, ১১টি স্বরবর্ণ (অ, আ, ই ইত্যাদি যেসব সাতটি স্বরধ্বনিতে উচ্চরিত হয়)

এবং ৩৮টি ব্যঞ্জনবর্ণের (ক, খ, গ ইত্যাদি) ব্যবহার ও গুটিকয়েক ক্ষুদ্রাকার চিহ্নের (া, ি, ী ইত্যাদি) যথারীতি প্রয়োগে পূর্ণতা লাভ করে।

ইংরেজি, ফরাসি, সংস্কৃত, ফার্সী, আরবি, উর্দু ইত্যাদি বিদেশী ভাষা থেকে সম্ভার আহরণ করে এই ভাষাকে আরো সমৃদ্ধ করা যেতে পারে। প্রবাসীদের ভূমিকা এখানে উল্লেখযোগ্য হতে পারে। আমাদের ভাষাকে পরিচিত করাতে এবং প্রবাস-দেশটির কিছু কিছু বহুল প্রচলিত শব্দকে নিজ ভাষায় অন্তর্ভুক্ত করতে প্রবাসীদের অবদান যথেষ্ট থাকতে পারে। আজ বহু ভারতীয় শব্দ ইংরেজিতে এবং প্রচুর উর্দু শব্দ আরবিতে (বা বিপরীতটিও) স্বীকৃত হয়েছে। এই সার্থকতার অন্যতম কারণ ইংল্যান্ড-আমেরিকা ও আরব দেশগুলোতে বহুকাল ধরে যথাক্রমে ভারতীয় ও পাকিস্তানী নাগরিকের বসবাস। বিদেশী শব্দ বা বাক্যশৈলী পরিগ্রহণে উদারতা দেখালে আমাদের ভাষার দৈন্যতা হবে না। তবে যেখানে সেখানে যেভাবে খুশি সেভাবে এটা হতে দেয়া যায় না। অপরদিকে চেয়ার, টেবিল, কলম, টেলিফোন, ইনটারনেট. অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ইত্যাদির পরিভাষা খুঁজতে যেন আমরা হিমশিম না খাই, যেন আমাদের ভাষাকে করে না তুলি দুর্বোধ্য ও কৃত্রিম।

কিছু ব্যতিক্রমী পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যকে (ক) নাটক, (খ) গল্প-উপন্যাস (গ) কাব্যে, যথাক্রমে (ক) বার্ণার্ডশ' (খ) ওসবোর্ণ, আলডূস হাক্স্লী, ই এম ফষ্টার, গ্রাহাম গ্রীণ, সমারসেট মম, (গ) টি এস এলিয়ট, ডিলেন টমাস প্রমুখ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে সমৃদ্ধ করেছেন। এতে তাদেরকে চশার, সেক্সপীয়ার, বেকন, সুইফ্ট্, জনসন, জেন অষ্টিন, ডিকেন্স এদের সাহিত্য হতে ভাবধারা, ষ্টাইল ও ভাষার প্রয়োগ থেকে অনেকটা সরে আসতে হয়েছে বটে। ভাষার ক্রমবিকাশ হতেই পারে - পঞ্চম শতক থেকে প্রচলিত ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের বিশ শতকের রূপ তো আর একই থাকতে পারেনা। আজকের ৩১ কোটি ৯০ লক্ষাধিক জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা ইংরেজি (যার স্থান ভাষাভাষীর সংখ্যার বিচারে চতুর্থ, ঠিক বাংলা ভাষার উপরেই) সর্বাধিক আন্তর্জাতিকতা অর্জন করেছে বড় বড় সাহিত্যিক, লেখক, ভাষাবিদদের কল্যাণে। সাথে সাথে এতে অবশ্য রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রভাব ছিলো সমধিক। আমাদের বিশ্বাস, ততটা নাহলেও বাংলাভাষা অচিরেই আরো বেশ খানিকটা আন্তর্জাতিকতা লাভ করতে পারবে।

ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার প্রাচীনকালে যাই থাকুক, অধুনা এটা ভিন্নতর রূপ নিচ্ছে। কয়েক দশক আগেও লক্ষ লক্ষ বাংলা ভাষাভাষী বিভিন্ন দেশে বহুসংখ্যায় বাস করতো না, বহুদেশে ভ্রমন করতো না, ব্যবসায়িক লেনদেন করতো না, পারিবারিক যোগসূত্র রক্ষা করতে পারতো না। ভ্রমনের সুবিধা, অধিক সচ্ছলতা, বেতার, টেলিভিশন তথা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমের জনপ্রিয়তা ও সহজলভ্যতা, ব্যবসা-বানিজ্যের আদান-প্রদান, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-একাডেমিক সম্মেলন, ইত্যাদির প্রভাব আগের তূলনায় অনেক বেশী।

কিছুকাল আগেও সত্তর দশকের গোড়ার দিকে বংগবন্ধুর বাংলায় ভাষনের পূর্বে জাতিসংঘ কখনো বাংলা ভাষা রাজনৈতিকভাবে বিশ্বের সকল দেশের কাছে অনুবাদের মাধ্যমে বা স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রচার করার কথা ভাবতে পারেনি; ১৯১৩ সনের আগে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরষ্কার-প্রাপ্তি পর্যন্ত পাশ্চাত্যে বাংলাভাষার নামও কেউ তেমনভাবে শুনেনি। ধীরে ধীরে এই ভাষার প্রসারতা বেড়ে চলেছে। অতএব, ১৯৯৯ এর একুশে ফেব্রুয়ারি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। নতুন শতকে এই ভাষার প্রচার, প্রসার, প্রয়োগ যেন হতে পারে নবতর উদ্যোগে, অধিকতর জোরদার করে। বাংলাদেশীদেরকেই মূলতঃ অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে - কারণ এর মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্রটির সম্মানজনক পরিচয়ের পরিধি বৃদ্ধি পাবে। [ভাষার উত্তরণের পরবর্তী স্বীকৃতির কথা এই গ্রন্থে "বিশ্বমাতৃভাষা দিবস, বাংলা ও বাংলাদেশ" শীর্ষক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য]।

মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় পনের লক্ষ এবং ইউরোপ-উত্তর আমেরিকা এবং অন্যান্য স্থানের আরো দশ-বারো লক্ষ বাংলাদেশী তাদের বিশেষভাবে অর্জিত রাষ্ট্রভাষাটিকে সত্যিসত্যি আন্তর্জাতিক ভাষা ও সাহিত্যে রূপান্তরিত করবেন - এটি আমার এবং সকল প্রবাসীর আশা। দৈন্যতা দূর করে সাংস্কৃতিক অংগনে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে যেন অগ্রসরতা সম্ভব হয়। এর দ্রুত বাস্তবায়নে সৌদিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ক্ষুদ্রাকারে হলেও যাতে একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে সেই কামনা করছি।

১১

নজরুল ঃ কালজয়ী প্রতিভা

অনেক কবি সাহিত্যিকের জীবদ্দশায় তার যথার্থ মূল্যায়ন হয় না। কারো বেলায় তা অহেতুক প্রশংসার রূপ নেয়, কারো ক্ষেত্রে তা সমালোচনার দাঁড়িপাল্লায় নিষ্ঠুরভাবে ঝুলতে থাকে।

আমাদের কবির বেলায় যেন এর এক ভারসাম্যহীন মিশ্রণ ঘটেছে। কেউ তাকে সে যুগের মুসলমান কবিদের মাঝে মধ্যমণি করে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, কেউবা তাকে সমকালের কবির উর্ধে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেছেন। তাকে অনেকে 'সাময়িক কবি' হিসাবে জানতেন বলে এই অভিব্যক্তি। সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কবি নিজেও, "বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে"।

পরবর্তীতে, তার জীবনকালেও প্রমাণিত হয়েছে তিনি যদি রবীন্দ্রনাথ বা বিশ্বকবি বা মহাকবিদের মতো সসম্মানে, সদম্ভে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থান নাও করে থাকেন, নজরুল শুধু যুগের কবিই নন। তিনি যুগস্রষ্টা! তিনি যুগোত্তরণ করেছেন। তিনি কালজয়ী। তাই যদি না হবে, তাহেল চল্লিশ দশকের শুরু থেকে (১৯৪২ এ তার চিরনিস্তব্ধতা) আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ সময়টি পর্যন্ত - অর্থাৎ ছয় দশককাল সময়ে তিনি কেন এখনো দেদীপ্যমান।
সাময়িক কবিই যতি হতেন নজরুল, তাহলে এতকাল পরেও কেন তার জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৮৭টি এবং বাংলাদেশে, যেখানে তিনি জাতীয় কবির মর্যাদা পেয়েছেন, ১৪১টির অধিক আলোচনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাকে ঘিরে। ইংরেজিতেও পনেরোটির মতো বই বেরিয়েছে। বাংলা একাডেমীর একটি ছোট বিভাগ থেকে চর্চা ও প্রকাশনা বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে নজরুল একাডেমী এবং এছাড়াও বর্তমানে আলাদা একটি পূর্ণাঙ্গ নজরুল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নজরুল চেয়ার সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে (যাতে এখন অধিষ্ঠিত আছেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম) এবং আরো তিনটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

অবশ্য এসবই যথেষ্ট নয়। আরো চর্চা, আরো গবেষণার মাধ্যমে নজরুলকে সবার মাঝে যথাযথভাবে উপস্থাপন করার জন্য পদক্ষেপ আবশ্যক এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিকভাবে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

নজরুল একজন মহাকবিও বটে। একজন সর্বকালের কবিও। সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে উঠে, ঘুমিয়ে থাকা জাতিকে নবজাগরণে উদ্বুদ্ধ করতে, অত্যাচারিত, নিপীড়িত, শোষিতদের স্বাধীনতায় প্রেরণা জোগাতে এত জোরালো বক্তব্যসহ কাব্য ও গানে তার চেয়ে বেশী আর কে পেরেছেন? তার সময়কার আরো দু'জন বহির্বিশ্বের কবিরও জীবনাবসান ঘটে অল্প সময়ে, ৩৮ বছর বয়সে ফরাসি কবি গিয়োম আপোলিনেয়ার এবং একই বয়সে হিস্পানী কবি ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকা-র। এর কিছুকাল আগের ইংরেজ কবি কীট্স, শেলী, বায়রন-এদেরও সাহিত্যিক জীবন ছিল খুবই অল্প এবং সবাই বিখ্যাত হয়েছেন। কিন্তু নজরুলের মতো সেসময় বাংলা সাহিত্যে তো নয়ই, বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যেও দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। কারোই ছিলো না একাধারে এত জনপ্রিয়তা, সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে এত বিচিত্রভাবে বিচরণ। তার কাব্যে, সাহিত্যে ও জীবনে গতিশীলতা এবং নব চেতনায় প্রেরণা উদ্রেক করার ক্ষমতা ছিলো অভূতপূর্ব। অবাক হতে হয় এত বাধা-বিপত্তি, অভাব অনটনের মধ্যে কী করে মাত্র তেইশ বছরের কর্মময় জীবনে তিনি এত বিশাল ভান্ডার সৃষ্টি করলেন - শুধু কি সৃষ্টি সুখের উল্লাসেই? নাকি নতুনের কেতন উড়াতেই, নাকি যুগের আহবানে অত্যাচার-অনাচার ভেঙে চুরমার করে সুন্দর শান্তিময় এক পৃথিবী দেখার ইচ্ছায় !

শিল্পের জন্য শিল্প না হয়ে শিল্প জীবনের জন্যও - তা বোঝাতে পেরেছিলেন বাস্তববাদী এবং জাতীয়তা ও মানবতায় সচেতন আমদের কবি। সে কারণেই তাকে বাংলাদেশ জাতীয় কবি

ঘোষণা দেবার বহু আগে তার বয়স যখন কেবল তিরিশ তখনই ১৯২৯ সালে কোলকাতার এলবার্ট হলে গুণী-জ্ঞানী মনিষীদের উপস্থিতিতে সকলের পক্ষ থেকে তাকে বাঙালির জাতীয় কবি-তে ভূষিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথকে ধরা হয় ভারতের জাতীয় কবি, ইকবালকে পাকিস্তানের, নজরুলকে প্রথমে তার জন্মস্থান ভারতে বাঙালির জাতীয় কবি, পরে তার কিশোর ও যৌবনের বেশ কিছুকালের বাসস্থান এবং শেষ জীবনের স্থায়ী বাসস্থান, বাংলাদেশে জাতীয় কবি হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করে দেখানো হয় সম্মান (আমাদের দেশ নিজেও হয় এতে সম্মানিত)।

নজরুল সাময়িক কবির উর্ধে ছিলেন। তার নিজের কথায়, একদিকে 'বর্তমানের কবি' বললেও আসলে তিনি, অন্যত্র তার কথায়, 'চিরদিনের কবি নজরুল' (কবির শেষ হস্তলিপি দ্রষ্টব্য)। তিনি যদি কালোত্তীর্ণই না হতেন তাহলে তার সৃষ্টিশীল জীবন নিস্তব্ধ হয়ে যাবার ষাট বছর পরে এখন শতবর্ষপূর্তি এমন বিপুলভাবে সর্বত্র উদ্‌যাপিত হতো না - তা সে ঢাকা, ত্রিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম হোক, চুরুলিয়া বা কোলকাতাই হোক অথবা তা লন্ডন, নিউইয়র্ক কিংবা আমাদের রিয়াদই হোক।

কোন কোন নজরুল বিশারদের মতে তিনি একজন বড় কবি, একজন মহাকবি। শুধু বাঙালি মুসলমানের কবি তিনি নন। তিনি মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকল বাঙালির কবি হিসাবে আমাদের ঐতিহ্যের স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা। নজরুল সম্বন্ধে কিছু মুসলমানের অহেতুক বিরূপ মনোভাব রয়েছে। সেই প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধে আলোচনার অবকাশ নেই। শুধু সংক্ষেপে বলা যায়, তিনিই ইসলামী বিষয়কে প্রথমবারের মতো কবিতায় গানে গদ্য-রচনায় 'সফল সাহিত্যিক রূপদান' করেন (আব্দুল মান্নান সৈয়দ)। এক্ষেত্রে নজরুলের অবিস্মরনীয় সৃষ্টি "কাব্যে আমপারা"র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

আসলে নজরুল ছিলেন সবার - সাম্প্রদায়িকতা ছাড়িয়ে। প্রথমে সবাইকে তিনি মানুষ হিসাবেই দেখেন - "এসো ভাই হিন্দু ! এসো ভাই মুসলমান ! এসো ভাই বৌদ্ধ ! এসো ক্রিশ্চিয়ান ! আজ আমরা সব গন্ডী কাটাইয়া, সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ, চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি"। একজন মহাকবির ভাষ্যেই একথা মানায়। আজকের বিশ্বে সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট কিছু কিছু সমাজে আমাদের জাতীয় কবির কথাগুলো বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, সে কসোভো-বোসনিয়া-চেচনিয়া-আফগান-ফিলিস্তিন হোক বা বাবরী মসজিদ এলাকাই হোক বা কোন দেশের মসজিদগুলোতে হত্যালীলাই হোক - 'ভাই ভাই' সম্পর্ক স্থাপনে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে বিশ্ব শান্তির পথ সুগম হতো অনেক।

তিনি আরেক অর্থে বিশ্বকবি। ডক্টর আনিসুজ্জামানের মতে তিনি 'দেশাতীত, কালাতীত'। নজরুলের অখন্ডতা, সমগ্রতা, এবং সর্বজনীনতা আরো প্রকাশ পায় কবির নিজের ভাষায়,

“আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশের এই সমাজের নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের ...”। নজরুল গবেষকদের একটি বড় কাজ হবে এই তত্ত্বের সমর্থনে ইংরেজি ভাষায় কিছু আলোচনা গ্রন্থ লেখা এবং তার কাব্যের যথার্থ অনুবাদ ইংরেজিতে আরো প্রকাশ করা। তবেই তিনি আরো আন্তর্জাতিকতা লাভ করবেন। আমরা আমাদের জাতীয় কবির জন্মশতবার্ষিকীতে উৎফুল্ল তো হবোই, সাথে সাথে এই কালজয়ী প্রতিভাকে বিশ্বের মাঝে নতুনভাবে উপস্থাপিত করার শপথ নেবো নতুন শতাব্দীতে। তার দ্বিশতবার্ষিকী (২০৯৯) আমাদের নতুন প্রজন্ম যেন পালন করতে পারে নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে এক বিশ্বকবি, এক মহাকবি ও এক কালজয়ী নজরুলকে আবিষ্কার করে।

১২

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষাঃ এর কিছু সমস্যা সমাধানে একটি অভিনব বিকল্প সংযোজন - উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে শিক্ষাসমস্যা অন্যতম। এর একটি দিক উচ্চশিক্ষা সমস্যা আমি আলোচনা করবো। আজকের সেমিনারে বিস্তারিত বিশ্লেষণের অবকাশ নেই বলে আমি উচ্চশিক্ষা বাস্তাবায়নের আলোকপাতে সীমাবদ্ধ থাকবো।

উচ্চশিক্ষা বলতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাকে বোঝাচ্ছি। ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, আইন, শিক্ষা, প্রভৃতি পেশামূলক শিক্ষাও এর অন্তর্ভূক্ত।

বর্তমান দশকে দরিদ্র বাংলাদেশে ছাত্র প্রতি বার্ষিক ১১,১২৩* টাকা খরচ করা হয়। অর্থাৎ গড়ে চার বছরের কোর্সে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করে তৈরী করা হয় একজন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় পাশ শিক্ষিত ব্যক্তি। যে কোন নাগরিকের মনে প্রশ্ন জাগে ঠিক এভাবে খরচ করে বর্তমানের, বা যে কোন গড় সময়ের, ৪০,২৭৯* জন বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রকে শিক্ষাদান করে বিনিময়ে, বিশেষত স্বাধীনতা উত্তরকালে, দেশ কি উপযুক্ত শিক্ষিত বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি পাচ্ছে ? যদি না পায়, এর প্রতিকার কি? গত দেড় দশকে চার বছরের উচ্চশিক্ষা, অধিকাংশক্ষেত্রেই ডিগ্রীপ্রাপ্তি পর্যন্ত ‘ছ বছরের মতো লেগেছে। তদুপরি রয়েছে চাকুরী নিয়োগকারী সম্ভাব্য সংস্থার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বদ্ধমূল ধারণা - এসব ছাত্রের বড় অংশটির শিক্ষালাভের মান আশাতীতভাবে নিম্নে।

আমাদের মতো উন্নয়নগামী দেশে আরো অধিক সংখ্যক লোক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হোক, আরো জ্ঞানলাভ করুক, এটা সকলের কাম্য। কিন্তু সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণ করলে, উচ্চশিক্ষার মানে যদি শুধু কাগুজে ডিগ্রীলাভ বা সার্টিফিকেট লাভ হয় এবং উচ্চতর জ্ঞানলাভ না হয়, তাহলে ঐতিহ্যবাহী বা সনাতন পদ্ধতিতে চলে আসা গোটা উচ্চশিক্ষারই আমূল পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।

অপরদিকে জ্ঞানলাভ পদ্ধতি কেবল শ্রেণীকক্ষের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা ঠিক নয়; বা আনুষ্ঠানিকভাবে বা ঐহিত্যবাহী প্রথায় সবার জন্য অর্থব্যয় করে এ শিক্ষা প্রচলিত রাখার যুক্তি নেই। যারা নিয়মিত এবং মেধাবী ছাত্র এবং যারা উচ্চপর্যায়ে শিক্ষকতা বা গবেষণা করবে অথবা বিভিন্নক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করবে, উচ্চশিক্ষা শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। অন্য যারা উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী হবে, এবং যারা নানা কারণে ব্যয়বহুল এবং নিয়মিত ক্যাম্পাস-শিক্ষালাভের সুযোগ পায় না, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে তাদেরও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা রাখা উচিত হবে। তবে তাদের জন্য এবং ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কৃত্রিম আভিজাত্যভাবকে মোচন করার জন্য অন্যান্য ১৮টি দেশের মতো প্রয়োজন হবে এক অভিনব উচ্চশিক্ষালাভ ব্যবস্থা। আর তার মাধ্যম হচ্ছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যলয়গুলোর বিকল্প বা substitute হিসেবে এসব উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হবে না, বরঞ্চ এর একটি বিকল্প-সংযোজন হিসাবে বা supplement হিসেবে এসব অবদান রাখবে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য হবে আগ্রহী, যোগ্যতাসম্পন্ন সবার জন্য অতি অল্প খরচে এবং যে কোন সময়ে একটি বৈজ্ঞানিক ও নিয়মিত পদ্ধতি বা সিষ্টেমের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ করে দেয়া; বয়স্ক এবং স্বাধীন শিক্ষার সকল উপকার লাভের সুবিধা দেয়া; কর্মজীবী বা পেশাজীবী বা বয়স্ক ব্যক্তিদেরও উচ্চশিক্ষার আলোতে উদ্ভাসিত করা। দাযিত্বপূর্ণ এবং সংযমশীল এসব শিক্ষার্থী নিজ নিজ পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য বা নতুন নতুন কর্মসংস্থানে উন্নতিলাভের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে আরো জ্ঞানলাভের আশায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

অপরদিকে ঐতিহ্যবাহী, ব্যয়হুল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বছরে চল্লিশ হাজার এর মতো সাধারণ বা মানবিক বিষয়াদির ছাত্রের জন্য বেশী প্রচেষ্টা এবং অর্থব্যয় না করে যদি যুগোপযোগী, ব্যবহারিক এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যায় বর্তমানের ১৪,৭৪৭* জন ছাত্রের তিনগুনসংখ্যক ছাত্রের পেছনে ব্যয় করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিজ্ঞানী এবং অন্যান্য বিজ্ঞানী সৃষ্টি করতে পারে তাহলেই দরিদ্র বাংলাদেশের জন্য উপকার হবে বেশী।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবদান এবং জরুরী প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করতে পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষার্থীরা যত বেশি সময় লাগাবেন, বাংলাদেশ বর্তমান সভ্যতার এক অভিনব শিক্ষালাভ পদ্ধতি ও মাধ্যম থেকে বঞ্চিত হয়ে ততই পিছিয়ে থাকবে।

বাংলাদেশে BIDE বা Bangladesh Institute of Distance Education এইপর্যন্ত কেবল শিক্ষা বা বি.এড. শিক্ষা কোর্স এই পদ্ধতিতে চালু করতে পেরেছে। এটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছে।

আধুনিক গণসংযোগ মাধ্যম ও টেলিকমিউনিকেশনের যথাযথ প্রয়োগ করতে না পারা আমাদের জন্য লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং ক্রমেই আমাদেরকে অনুন্নয়নের দিকে নিয়ে যাবে। আর এই গণসংযোগ মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হচ্ছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং দুরপাল্লা শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম।

ডাকবিভাগের মাধ্যমে ডাকে শিক্ষাবস্তু, টেলিফোনে জরুরী এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ/পরামর্শ, ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন গ্রন্থ বা রেফারেন্সের অনুসন্ধান, কম্পিউটার টার্মিনালের মাধ্যমে তা দর্শন, টিভি, ভিডিওর যথার্থ ব্যবহার, স্লাইডের জন্য প্রজেক্টর, শুনবার ও রেকর্ড করে রাখার জন্য বেতারের প্রশিক্ষণ, ক্যাসেট প্লেয়ার, ফটোকপি ব্যবস্থা - এই শিক্ষায় গভীর অবদান রাখে। এছাড়া বিশেষ বিশেষ প্রকার পরামর্শের জন্য অথবা প্রাকটিক্যাল-সংশ্লিষ্ট কোর্সের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিশেষ বিশেষ সেন্টার, এর প্রয়োজন মেটায়। সেখানে সংশ্লিষ্ট, বিজ্ঞ প্রশিক্ষক উপস্থিত থাকেন টিউটিরিয়াল বা কন্সাল্টেশনের জন্য।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং দূরপাল্লা শিক্ষাপদ্ধতিতে যেসব সুবিধা এবং যেসব কারণে এর প্রয়োজনীয়তা, তার কতগুলো এখানে উল্লেখ করা হলোঃ -

১। আমাদের দেশের গত গেড়দশকের উচ্চশিক্ষায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এখন থেকে অধিকাংশ ছাত্রকে স্ব স্ব দায়িত্বে পড়াশুনা করার ও তার জন্য অকুণ্ঠ দরদ সৃষ্টি করতে এবং নিজ নিজ ভবিষ্যতের জন্য নিজ থেকে অধ্যয়নে মনোযোগী হবার সুযোগ দেয়। বয়স্ক শিক্ষার সকল উপকার এতে বিদ্যমান।

২। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, innovative; এটা সনাতন রুটিন-প্রথা থেকে মুক্ত। এই শিক্ষা অন্যভাবে ব্যস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত।

৩। সনাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপযুক্ত শিক্ষকমন্ডলীর অপ্রতুলতা হেতু উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় কম সংখ্যক শিক্ষক থেকেই অধিকসংখ্যক ছাত্র উপকৃত হবে।

৪। বেশ কিছু দেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষার ধাপ কৃতকার্যতার সাথে পার হয়ে এসেছে এবং শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে।

৫। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে যে কোন বয়সের, যে কোন শিক্ষার্থীর জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রযোজ্য। এটা যে কোন স্থানে হতে পারে; ঘরে বসেও।

৬। On the job প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, এই শিক্ষায়।
৭। সনাতন উচ্চশিক্ষালাভ থেকে যারা বঞ্চিত তাদের জন্য এই বিকল্প সংযোজন উন্মুক্ত।
৮। উচ্চশিক্ষার সুফল গ্রাম বাংলায় এবং শহরকেন্দ্রিক স্থান থেকে দূরেও পৌঁছানোর সুবিধা রয়েছে এতে।
৯। সময়, স্থান, কার্যসূচী প্রয়োজন অনুযায়ী flexible।
১০। স্নাতক শিক্ষাপদ্ধতি থেকে বঞ্চিত মেধাবী, talented এবং gifted লোকদের আবিষ্কার করতে সাহায্য করে এই শিক্ষা।
১১। Continued education এর উদ্দেশ্যাবলী পুরণ করে।
১২। পেশাগত মান উন্নয়ন এবং career প্রস্তুতিতে সহায়তা করে।
১৩। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের মনগড়া ivory tower থেকে যেখানে জনগণের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সার্থক হচ্ছে।
১৪। উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী মহিলাদের জন্যও এই শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে।
১৫। যা আমাদেরই মতো উন্নয়নগামী ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে গত কয়েক বছর ধরে উত্তরোত্তর সার্থকতার সাথে প্রচলিত হয়ে আসছে, তা বাংলাদেশেও অচিরে চালু হওয়ার সুযোগ করে দিবে।

যুক্তরাজ্য (১৯৬৯), স্পেন (১৯৭২), ইরান (১৯৭৩), পশ্চিম জার্মানী (১৯৭৪), পাকিস্তান (১৯৭৪), কানাডা (১৯৭৫), জাপান (১৯৭৫), ভারত (১৯৮২) প্রভৃতি দেশগুলোর মতো অনেক দেশেই ইতোমধ্যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে। লক্ষ্যনীয়, আমাদের কাছাকাছি সব রাষ্ট্রেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকর হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, যেসব মেধাবী বা উপযুক্ত এবং আগ্রহী ছাত্র বিভিন্ন ধরনের কাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়ে বয়স বেড়ে যাবার জন্য উচ্চ শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারেননি তাদের জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় একটি সুবর্ণ সুযোগ। এই শিক্ষাপদ্ধতি চালু হলে আমাদের দেশে স্কুল শিক্ষক, কর্মরত চাকুরে বা ব্যবসায়ী, মুক্তিযোদ্ধা, এদের মতো আরো বহু নাগরিক উচ্চশিক্ষিত মানুষ হিসাবে স্বদেশের জন্য গভীর অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।

[প্রথমে রিয়াদস্থ ঢাকা ইউনিভারসিটি এলামনাই এসোসিয়েশন সৌদি আরব শাখা আয়োজিত একটি সেমিনারে লেখাটি পঠিত হয় ১৯৮৭ সনে। প্রবন্ধকার এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। পরে বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশের মূল সমস্যা ও তার সমাধান” গ্রন্থে প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সনে।

আমাদের জানামতে, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পদ্ধতির উপর বাংলাভাষায় রচিত এইটিই প্রথম প্রবন্ধ এবং প্রস্তাব। এর প্রায় পাঁচ বছর পর প্রতিষ্ঠিত হয় ‘বাংলাদেশ উন্মুক্ত

বিশ্ববিদ্যালয়'। সেখানে কিছুকালের জন্য প্রবন্ধকারের সৌভাগ্য হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের প্রথম ডাইরেক্টর (পূর্ণ প্রফেসর) হিসাবে কাজ করার। উচ্চতর প্রশিক্ষণ উপলক্ষে আমার প্রথম লন্ডন যাওয়া হয় ১৯৭৩ সনে। সেসময় অনেকটা কৌতুহলবশে এই নগরীর চল্লিশ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত, বছর তিনেক আগে প্রতিষ্ঠিত, মিলটন-কেইন্‌স শহরে ওপেন ইউনিভারসিটি অব ইউ কে দেখার সৌভাগ্য হয়। তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুটা অবগত হই এবং বিস্মিত হই। নতুন শিক্ষাদান মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হই। পরবর্তীতে বাংলাদেশে এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। তাও প্রবাসে বসেই - সৌদিতে কর্মরত থাকা অবস্থায়ই। অবশ্য নিজেকে আরেকটু সচেতন করার জন্য পরবর্তীতে দিল্লীর ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভারসিটি এবং কানাডার ওপেন ইউনিভারসিটি ও কমনওয়েল্‌থ অব লার্নিং পরিদর্শন করার সুযোগ হয়। তথাপি, আমি ১৯৮৭ সনে লিখিত এবং রিয়াদের সেমিনারে পঠিত বর্তমান প্রবন্ধটি অপরিবর্তনীয় রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। - লেখক]

১৩

দুটি শুভেচ্ছাবাণী

(ক) সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় উৎসাহ প্রদান

প্রবাসে কর্মময় জীবনে সাহিত্য চর্চার প্রচেষ্টা করা এবং তা অব্যাহত রাখতে পারা, বাস্তবিকই একটি কঠিন কাজ। তা সত্ত্বেও এবং বিশেষ করে এই কাজের জন্য বলতে গেলে প্রতিকূল পরিবেশে যারা সাহিত্য সংস্কৃতির সেবা করে যাচ্ছেন, তাদের জানাই সাধুবাদ। থাক না তাতে আকাঙ্ক্ষিত বিষয়াদির ক্ষাণিকটা কমতি। তবু তো কিছু পাওয়া যায় উৎকৃষ্ট মানের সাহিত্য ফসল। এমনি করেই একদিন আমাদের সাহিত্য শিল্প-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হবে, প্রিয় মাতৃভূমির সুকুমার বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিভাত হবে সুদূর মরুপ্রান্তরেও। বিদেশী এবং অন্যান্য প্রবাসীরা একদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকবেন উন্নতমানের অধিকতর সৃষ্টিকর্মের জন্য।

"রূপসী চাঁদপুর" এমনি একটি পদক্ষেপ বলে আমি ধারণা করছি, এর কোন কোন সৃষ্টি সবাইকে আপ্লুত করবে বৈ কি! ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠতর প্রকাশনার নিদর্শন পাবো, এই আশা করি। চাঁদপুর সংসদের প্রথম বিশেষ এবং বড় অনুষ্ঠানটিতে কয়মাস আগে উপস্থিত থাকবার সুযোগ আমার হয়েছিলো - গোটা অনুষ্ঠানটিতেই শিল্প-সাহিত্য মনের ছোঁয়া প্রত্যক্ষ করেছি। নেহায়েত উৎসাহ এবং প্রাণের টানেই সম্ভব হয় এমন অনুষ্ঠান পালন এবং পরবর্তীতে বর্তমান সাহিত্য সংকলন।

তাই আমি "রূপসী চাঁদপুর"এর সঙ্গে জড়িত সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রবাসী অন্যান্যদের প্রতিও রইলো আমার আবেদন- নিজ নিজ কাজের অবসরে সময় করে নিয়ে প্রত্যেকেই কিছু সাহিত্য শিল্প-সংস্কৃতি চর্চায় অবদান রাখুন। কেউ লেখালেখি করে, কেউ বা এসবের পৃষ্ঠপোষকতা করে। কর্মশেষে এগুলোই অনন্তকাল ধরে মানসিক তৃপ্তিদান করবে- সকল বাস্তবতাকে ডিঙিয়ে শ্রান্তি ও সান্ত্বনার রাজ্যে নিয়ে যাবে আমাদের। সুন্দর মন ও পরিবেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবে সকলকে।

["রূপসী চাঁদপুর" সাময়িকীতে শুভেচ্ছাবাণী, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী ২০০১]

(খ) সমাজসেবা ও সাহিত্যকর্মের পাশাপাশি-চর্চা

যে কোন সাহিত্যকর্ম মানুষকে কখনো না কখনো আনন্দ দেয়, তথ্য প্রদান করে, জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করে, জীবনকে ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে, সুন্দরের স্পর্শলাভে উৎসাহিত করে। প্রবাসে সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ সবার হয় না- বিশেষ করে মাতৃভাষায়। তবু এর মাঝে যারা যারা তাদের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে সক্রিয় রাখতে চেষ্টা করেন, অন্যদেরকে এর স্বাদ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন, তাদের ধন্যবাদ জানাই।

প্রবাসী "জালালাবাদ সমিতি" এবারেও তাদের 'স্মরণিকা' প্রকাশ করছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই নিজস্ব সংগঠনের কিছু তথ্য পরিবেশিত হবে, সাথে সাথে যে সামান্য সাহিত্য অন্তর্ভুক্ত হবে, তা আশা করি পাঠকদের কাছে উপভোগ্য হবে।

অনুষ্ঠান এক সময় শেষ হয়ে যাবে, ঘোষিত সাংগঠনিক কাজগুলো চলতে থাকবে, অন্যের কল্যাণে। স্থায়ীভাবে থেকে যাবে তথ্য, আনন্দ এবং লেখালেখির অবদান সম্বলিত স্মরণিকাটি। আমার কাছে তাই এই ধরনের প্রকাশনার মূল্যও কম নয়। শুধু প্রয়োজন এই রকম প্রকাশনাকেও যথাসাধ্য সুন্দর ও শুদ্ধভাবে ছাপানো। অঙ্গসৌষ্ঠব চাকচিক্যময় বা ব্যয়বহুল হতে হবে, এমন কথা নেই। শিল্পসুলভ, পরিপাটি যতটা করা যায়, ততই তা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

সমিতির কর্মধারা বরাবরই ছিল প্রশংসনীয়। এর একাধিক অনুষ্ঠান উপভোগ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। প্রবাসে এই জাতীয় অপরাপর সমিতি তাদের নিজস্বগুলোতে প্রয়োগ করার কিছু দৃষ্টান্ত এখানে পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

সমাজসেবা এবং সাহিত্যকর্ম যে পাশাপাশি চলতে পারে - জালালাবাদ সমিতির মতো প্রবাসের অন্যান্য সমিতিগুলো - আমাদের তা শেখায়। আমি তাই এর উত্তরোত্তর কৃতকার্যতা এবং উন্নতি কামনা করছি।

["জালালাবাদ স্মরণিকা" ২০০১ সন - শুভেচ্ছাবাণী]

১৪

প্রবাসীদের দৃষ্টিতে অগ্রাধিকার বিষয় সমূহ

একটি নতুন স্বাধীন দেশের প্রবাসী নাগরিকদের নিজেদের জন্য এবং তাদের পক্ষ থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু সুপারিশ এখানে সংক্ষিপ্তাকারে সন্নিবিষ্ট হলো। এর অধিকাংশই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে কমবেশী আলোচিত হয়েছে। কতগুলো অবশ্য নতুন।

১। জাতীয় দুর্বল বিষয়গুলো থেকে মুক্তি পাবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। সকলের সাথে এসব ইস্যুতে দলমত নির্বিশেষে ঐকমত্য স্থাপন করে যথাসম্ভব অবদান রাখতে হবে। যথাঃ স্বাধীনতা রক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দেশের মজবুত অবকাঠামো সৃষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত বিষয়ে অধিকতর দৃষ্টিদান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দেশে ও প্রবাসে অংশগ্রহণ, সামাজিক অবক্ষয়রোধ, দূর্নীতি দমনে সহযোগিতা, ইত্যাদি।

২। (ক) দেশে ও প্রবাসে দেশের সত্য ইতিহাস প্রচার করতে হবে। (খ) বিশেষ করে, নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতার তাৎপর্য সম্বন্ধে অবগত করাতে হবে।

৩। সামর্থ্যের বাইরে বিলাসদ্রব্যে ব্যয় থেকে নিজেকে এবং দেশে রেখে আসা আত্মীয়স্বজনদেরকে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় করে কেনাকাটা থেকে বিরত রাখতে হবে।

৪। প্রায়োগিক বা যুগোপযুগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে তরুণ ও যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করে বর্তমান ও আগামী দিনের জন্য তৈরী করতে হবে।

৫। (ক) শিক্ষার গুণগতমান বাড়াতে হবে। (খ) প্রত্যেক নাগরিককে শিক্ষার আলো দান করতে হবে।

৬। (ক) প্রবাসী বাংলাদেশী স্কুলগুলো উন্নয়নের জন্য অভিভাবক ছাড়াও কমিউনিটির অন্যান্য সমর্থ প্রবাসীদের সাহায্য কামনা করতে হবে। (খ) প্রবাসী ইংরেজি মাধ্যম বাংলাদেশী স্কুলগুলোতে আরো জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

৭। (ক) প্রবাসী পেশাজীবী ও অন্যান্যদের বাংলাচর্চা ও সাহিত্যসেবায় আরো যত্নবান ও তৎপর হতে হবে। (খ) জ্ঞান, জীবিকা ও প্রয়োজনের তাগিদে আরো উত্তমভাবে ইংরেজি, আরবি, প্রভৃতি আবশ্যকীয় ভাষা রপ্ত করতে হবে।

৮। স্বদেশের প্রতিটি অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের লোকই আমাদের সম্পদ ও নাগরিক। এদের মধ্যে কৃত্রিম ভেদাভেদ পরিহার করতে হবে।

৯। অদক্ষ শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দিয়ে আরো দক্ষতা অর্জন ও উপার্জনক্ষম করাতে হবে। কৃষককে আধুনিক পদ্ধতি শেখাতে হবে। চাকুরেদেরকে সততা ও যোগ্যতার সাথে কাজ করাতে হবে।

১০। (ক) আমলাদেরকে স্বাধীন রাষ্ট্রের উপযোগী সেবার মানসিকতায় অনুপ্রাণিত করতে হবে। (খ) সিভিল সার্ভিসকে শ্রেষ্ট আকর্ষণীয় ক্যারিয়ার হিসাবে গড়ে না তুলে, উন্নত

দেশের মতো, টেকনোক্র্যাট বা পেশাজীবীদের প্রাধান্য দিতে হবে। (গ) মেধা ও যোগ্যতার উপর এবং উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে ভূমিকা পর্যালোচনা করে কর্মাচরি-কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, চাকুরিকাল নির্ধারণ করতে হবে। দলগত ও প্রভাবগত বলয় হবে অবিবেচ্য।

১১। নাগরিকের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে - যথাঃ, সময়মতো এবং যথানিয়মে ট্যাক্স বা খাজনা প্রদান, পাবলিক সার্ভিসেস বিল পরিশোধ, ইত্যাদি।

১২। প্রবাসের স্থানীয় বাংলাদেশী জনকল্যাণমূলক সংগঠনগুলোতে ভূমিকা রাখতে হবে, যথাঃ নিজে অংশগ্রহণ করে, অন্যদের উদ্বুদ্ধ করে, সামর্থ্যানুযায়ী আর্থিক ও নৈতিক সহযোগিতা করে।

১৩। প্রবাসে ছোটখাটো ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি না করে, স্থায়ীভাবে সম্পর্কচ্ছেদ না করে, মিলেমিশে সহমর্মী হিসাবে থাকতে হবে।

১৪। (ক) প্রবাসে স্বীয় ক্ষেত্রে যথাসাধ্য যোগ্য ভূমিকা পালন করে, কর্তৃপক্ষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নিজের ও দেশের ভাবমূর্তি বাড়াতে হবে। প্রত্যেকে যেন স্বদেশের এক একজন দূতও। (খ) স্বদেশে ফিরে গিয়েও নিজ নিজ পেশায় উদাহরণ সৃষ্টিকারী ভূমিকা রাখার পরিকল্পনা থাকতে হবে প্রত্যেক প্রবাসীর।

১৫। স্বাগতিক দেশে বা বহির্বিশ্বে স্বাধীনতাত্তোর কালে স্বদেশে যা কিছু ভালো কাজ বা উন্নতি অর্জিত হয়েছে তা ব্যক্তিগত পর্যায়েও প্রচার করতে হবে।

১৬। (ক) স্বদেশে, বিরোধী দলগুলোর ভূমিকা যেন শুধু বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতায় সীমাবদ্ধ না থাকে। সরকার ও বিরোধী - উভয়দলের মধ্যে সমঝোতা ও সহিষ্ণুতা বাড়াতে হবে। (খ) রাষ্ট্রের সার্বিক স্বার্থে সরকার ও কর্তৃপক্ষকে বাস্তব ও সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দিতে জাতীয় পর্যায়ে একটি উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করতে হবে যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন প্রবাসী বা প্রত্যাগত বাংলাদেশীদের একাধিক প্রতিনিধিও। (গ) দেশে ছাত্রদের দলীয় রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে তাদের মূল কাজ, লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করাতে হবে। দীর্ঘ ছুটির সময় জাতিগঠনমূলক কাজে অংশ নেয়াতে হবে।

১৭। বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যতের জাতীয় বিষয়াদিতে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের বিবেকবান ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের এবং বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা আরো সক্রিয় হতে হবে।

১৮। বিশ্বের আধুনিক ধারা অনুযায়ী এবং স্বদেশের শীঘ্র উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়নে সকলের জোর ভূমিকা থাকতে হবে।

১৯। শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে ও সন্ত্রাস দমনে সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

২০। প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। যথাঃ, স্বদেশে এবং প্রবাসে তাদের পোষ্যদের জন্য যথাযথ শিক্ষাব্যবস্থা; প্রত্যাগত প্রবাসীদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা; গৃহনির্মাণ ও সহজসাধ্য আকর্ষণীয় পুঁজি বিনিয়োগে সহযোগিতা; তাদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ইত্যাদি। পঁচিশ-তিরিশ লক্ষ প্রবাসী বাংলাদেশী যেন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরও দেশের সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হতে পারেন।

যবনিকা